আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৯

স্বজন

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক

স্বজন-সাহিত্য সাময়িকী

পঞ্চম সংখ্যা

প্রকাশনা উপকমিটি

আহ্বায়ক : **নাছিমা বেগম এনডিসি**
সহ সভাপতি, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক।

সদস্য : **প্রফেসর ড. দিলারা হাফিজ**
সহ সভাপতি, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক।

বিলকিস বেগম
যোগাযোগ, প্রচার ও তথ্য বিষয়ক সম্পাদক, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক।

সদস্য সচিব : **সালমা বেগম**
সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক।

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
কলেজ গেট বাইন্ডিং এন্ড প্রিন্টিং
১/৭, কলেজ গেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

প্রকাশকালঃ
০৮ মার্চ ২০১৯

উৎসর্গ

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে যে সকল
নারীশক্তির সম্মিলিত প্রয়াসে
আজকের নারীদের অবস্থান ও
ক্ষমতায়নের উৎস, সে সকল মহতী
ও আলোকিত অগ্রজদের জানাই
গভীর কৃতজ্ঞতা।

উপদেষ্টা পরিষদ

সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

সচিব, অর্থ বিভাগ।

সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

রেক্টর, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ, ঢাকা।

ড. শেলীনা আফরোজ
সাবেক সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বেগম মুশফেকা ইকফাৎ
বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আক্‌তারী মমতাজ
সাবেক সচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন।

প্রফেসর ফাহিমা খাতুন
সাবেক মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ফাতেমা বেগম
সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি, বাংলাদেশ পুলিশ।

ড. নমিতা হালদার এনডিসি
সাবেক সচিব, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

কার্যনির্বাহী কমিটি

সভাপতি	: **সুরাইয়া বেগম,** এনডিসি তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন।
সহ- সভাপতি	: **নাছিমা বেগম,** এনডিসি সাবেক সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সহ-সভাপতি	: **দিলরুবা** সাবেক সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
সহ-সভাপতি	: **প্রফেসর ড. দিলারা হাফিজ** সাবেক চেয়ারম্যান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড।
মহা-সচিব	: **নাসরিন আক্তার** সাবেক সচিব জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী।
যুগ্ম মহাসচিব	: **ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম** অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।
যুগ্ম মহাসচিব	: **রৌশন আরা বেগম,** এনডিসি অ্যাডিশনাল আইজি, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা।
কোষাধ্যক্ষ	: **রাশিদা বেগম** অতিরিক্ত সচিব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
সহকারী কোষাধ্যক্ষ	: **শাহেদা খানম** সাবেক সিনিয়র ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, ঢাকা।
সাংগঠনিক সম্পাদক	: **শেখ মোমেনা মনি** উপসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
দপ্তর সম্পাদক	: **শিরীন রুবী** উপসচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
কল্যাণ সম্পাদক	: **দিলরুবা শাহিনা** উপপ্রধান, এসইপি প্রকল্প।

যোগাযোগ, প্রচার ও তথ্য সম্পাদক : **ড. বিলকিস বেগম**
উপসচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক : **সালমা বেগম**
সহকারী অধ্যাপক
সরকারী তিতুমীর কলেজ, ঢাকা।

উন্নয়ন ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক : **ফারহিনা আহমেদ**
যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সদস্য

শাহনাজ পারভীন
প্রেসিডেন্ট, কাস্টম এক্সাইজ ঢাকা।

সানজিদা খাতুন
কমিশনার, ইনকাম ট্যাক্স, ঢাকা।

মোছাঃ মোবাশ্বেরা কাদেরী
পরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

তানিয়া খান
উপপ্রধান, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

নাঈমা হোসেন
উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আছমা সুলতানা
উপসচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সূচিপত্র

প্রিয় কথন... ০৯
মুখবন্ধ ১১
আহ্বায়ক এর কথা ১৩

কবিতা

তৃষিত হৃদয় - ড. শাহিদা আক্তার ১৫
অতি সাধারণ - শাহীনা খাতুন ১৬
দুরত্ব - শেখ মোমেনা মনি ১৮
বসন্তের বৃষ্টিতে..... দূরবর্তী তোমায় - নাঈমা হোসেন ১৯
মাকে ভালোবাসিস - ড. আসমা বেগম ২০
মানবিক সমাজ - ড. আলেয়া পারভিন ২১
বিশ্ব সকলের - আফরোজা নাছরীন ২২
জীবন নদী - জান্নাতুল বাঁকিয়া ২৪
এসো, গল্প করি - জান্নাতুল ফেরদৌস ২৫

প্রবন্ধ

স্থানীয় সরকার ও তৃণমূলে নারী নেতৃত্বের বিকাশ - নাছিমা বেগম, এনডিসি ২৭
জীবন্ত স্মৃতিসৌধ - মাজেদা রফিকুন নেছা, এনডিসি ৩৬
নারী স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা - প্রফেসর ড. দিলারা হাফিজ ৪৬
টেকসই উন্নয়নে কর্মজীবী নারীর ভূমিকা প্রেক্ষিত: বাংলাদেশ - ড. অনিমা রানী নাথ ৫৬
ম্যাগী - বনানী বিশ্বাস ৬৪
প্রাপ্তি (অনুগল্প) - ইসরাত বানু ৬৮
SGDs এর প্রেক্ষাপটে নারী ভাবনা - মালেকা আক্তার চৌধুরী ৬৯
শিশু মনস্তত্ত্ব এবং আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা - ড. মালেকা বিলকিস ৭৩
নারী নির্যাতন বাড়ছে কেন? - সালমা বেগম ৭৬
তারণ্য ভাবনা - আখতার জাহান শাম্মী ৭৯
সমাজ পরিবর্তনে গান্ধীর সর্বোদয় তত্ত্ব - ফারজানা হোসেন ৮১
ভারতবর্ষে নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও নারীবাদের উদ্ভব - ড. ফাহিমা আক্তার ৮৪
ফেমিনিজম: উৎস, শাব্দিক এবং সাহিত্যিক প্রেক্ষণ বিন্দু - খালেদা জাহান ৯২

নেটওয়ার্কের কার্যক্রমের অংশবিশেষ ৯৭

সভাপতি
বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক

প্রিয় কথন ...

সাহিত্য আশ্রয় করেই মানব জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাস রচিত হয়েছে। সমাজে স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জাতীয় বিবেকবোধ ও নাগরিক দায়িত্বশীলতা সৃষ্টিতে সাহিত্যের অবদান বহুমাত্রিক। যে কোন অশুভ অসুন্দরের বিরুদ্ধে সাহিত্যের ভেতর আশ্রিত হয়েছে প্রতিবাদের ভাষা, যে ভাষা ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলেছে সংগ্রাম মুখর মানুষের মর্মমূলে।

উনবিংশ শতকের আবদ্ধ নারী সমাজকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন বিভিন্ন কল্যাণকর কর্ম আর ব্যক্তিত্ববোধ বিকাশের ঝান্ডা উড়িয়ে এগিয়ে এসেছিলেন দৃঢ়তার সাথে। তিনি মুসলিম মেয়েদের জন্য স্কুল খুলেছেন; স্বপ্ন দেখেছেন তাঁর স্কুল পড়ুয়া মেয়েরা একদিন জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হবে। তাঁর দেখানো পথকে পাথেয় হিসেবে নিয়ে নারী সমাজ আজ সর্বত্র একান্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁর স্বপ্নের জজ-ম্যাজিস্ট্রেটরা বাস্তবেই বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস উইমেন নেটওয়ার্ক এর সদস্য হয়ে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। তাঁরা আজ দেশের নীতি নির্ধারণীতে যেমন আছেন, তেমনি আছেন তৃণমূল পর্যায়ে প্রশাসনিক বা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের বেলায় প্রত্যয়বদ্ধ লড়াকু সৈনিকের মতো।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুপরিকল্পিত ও অদম্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আজ সারা বিশ্বের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। দেশ পৌঁছে গেছে মধ্যম আয়ের দেশে। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রাকে আরও গতিশীল ও টেকসই করতে হলে নারীর সমান অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত জরুরী।

কর্মজীবনের শুরু থেকেই লক্ষ্য করি দু:খী মানুষের দু:খ অনুভব, মানবিক বোধ আর স্বদেশ প্রেম অন্তরে ধারন করে সরকারি কর্মকর্তাদের জীবন প্রবাহ। স্বত:স্ফূর্তভাবে তাঁদের সেবার হাত প্রসারিত হয়, তাঁদের আছে প্রতিবাদী মন। তা আছে বলেই সমাজের বিভিন্ন কুসংস্কার, জড়তা, বৈষম্য নিরসন করে পরিবর্তিত নতুন উন্নত সমাজ ও দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

শিল্প সচেতন এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নারী কর্মকর্তাদের লেখনী নারী সমাজের বিভিন্ন অধিকার প্রতিষ্ঠায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সমগ্র মানবকল্যাণে নিবেদিত।

সিভিল সার্ভিসের নারী কর্মকর্তাগণ সমাজ এবং জীবনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পান। দায়িত্ব ও কর্মের প্রয়োজনে তারা মানুষের সাথে যোগাযোগ গড়ে তুলেন। ফলশ্রুতিতে তারা জীবনকে গভীরভাবে অনুভব করেন। সুতরাং তাদের গল্প-কবিতায় স্বাভাবিকভাবেই উঠে এসেছে এবং আসছে জীবনানুভূতি ও সমাজ পর্যবেক্ষণের ছবি । আমি আশা করি, এ প্রকাশনায় নারী কর্মকর্তাদের লেখনীতে ফোটে উঠা সাহিত্যের বুনন, সমকালীন আবেদন ও কার্যকালীন প্রাসঙ্গিকতা, সৃজনশীলতা পাঠকের মনে রেখাপাত করবে। পাশাপাশি তাদের জীবনমুখী ভাবনা, ভাষার সৌন্দর্য ও ব্যঞ্জনার কারণেও লেখাগুলি উত্তম সৃষ্টি হিসেবে পাঠকের মনে স্থান করে নেবে।

নারী অগ্রযাত্রার আরেক পথিকৃৎ কবি সুফিয়া কামালের ভাষায়- "আমাদের অধিকারগুলো আমাদের নিজেদের অর্জন করতে হবে..... নারী উন্নয়নমূলক সংগঠনগুলোর মাধ্যমে মেয়েরা যতবেশি সংগঠিত হয়ে এগিয়ে আসবে মেয়েদের উন্নয়নের পথ তত বেশি সুগম হবে।" বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এদেশের সকল নারী কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে কাজ করবে; পাশাপাশি শিক্ষা-দীক্ষায়, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে নারী সমাজের যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে সেই অর্জনকে টেকসই করার নেতৃত্বে আত্মপ্রত্যয়ী হতে সাহস যোগাবে, এই কামনা করি।

তোমাদের জ্ঞানের আলোর মহিমায় উদ্ভাসিত হোক পুরো সমাজ-সভ্যতা, আলোকিত হোক দেশ ও জাতি...

সুরাইয়া বেগম এনডিসি
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন।

মহসচিব
বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক

মুখবন্ধ

সকলের দৃষ্টির আড়ালে, সারাদিনের কাজের শেষে অবসর খুঁজে নারীরা তাদের কথা লিখে। কেউ পড়বে- এই আশা নিয়ে হয়তো লিখে না। তাদের কুণ্ঠিত লেখালেখির আড়ালে হয়তো থাকে অন্তর্গত তাগিদ অথবা অবদমিত আত্মপ্রকাশের আকুতি। শিল্পসাহিত্য অঙ্গনে নারীর পদচারণা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। নারীর ভাষা কেমন হওয়া উচিত-অনুচিত এসবের নির্ধারিত বেড়াজাল ডিঙিয়ে নারী তাঁর নিজের মতো লিখে চলেছেন। সাহসী নারী শিল্পী-সাহিত্যিক কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে গণ্ডি ভাঙছেন। তাঁদের সৃষ্টি সকলকে বিস্মিত করছে। কারণ, শিল্প-সাহিত্যের জগতে নারীর অবাধ পদচারণের বয়স পুরুষের তুলনায় অনেক কম। 'পুরুষ এখনো কেবলই পুরুষ এবং নারী হচ্ছে নারী ও পুরুষ উভয়ের সম্মিলন।' এতকাল অধিকাংশ পুরুষের সাহিত্যে যে খণ্ডিত নারী উঠে এসেছে, নারী সাহিত্যিক তাকে সম্পূর্ণ করার অঙ্গীকারে লেখনী ধরেছেন।

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক 'স্বজন' এর মাধ্যমে কর্মরত নারী প্রতিভাকে বিকশিত করার প্রয়াস হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে 'স্বজন' সাহিত্য সাময়িকী এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে কর্মরত নারী কর্মকর্তাদের মনের ভাষা সকলের দ্বারে উন্মুক্ত হয়েছে। সকলে তা সাদরে গ্রহণ করেছেন কারন নারীর ভাষা যে মানুষেরই ভাষা। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা 'স্বজন' সাহিত্য সাময়িকী পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছি বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সকল সদস্যদের অকৃত্তিম ভালোবাসা ও সহযোগিতায়। আপনারা যারা এ স্মরণিকা প্রকাশনার মাধ্যমে বিসিএস-এ কর্মরত নারীদের প্রতিভা স্ফুরনে সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিবাদন।

পরিশেষে বলতে চাই জীবন একটাই এবং এ জীবনকে প্রিয় জীবন হিসেবে উপভোগ করতে পারাই একজন নারীর সবচেয়ে বড় সার্থকতা।

নাসরিন আক্তার
সরকারের সাবেক সচিব

আহ্বায়ক
প্রকাশনা উপকমিটি
বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক

আহ্বায়ক এর কথা

নারী ছাড়া পুরুষ অচল, পুরুষ ছাড়া নারী
নারী-পুরুষ সমতার সুখের ভুবন গড়ি।

নারী ও পুরুষ একজন আরেকজনের পরিপূরক। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নারী-পুরুষের মধ্যে তৈরি করেছে বৈষম্য। কখনো কখনো নারীকে করেছে কর্মহীন। যুগে যুগে নারীরা হয়েছে অবহেলিত। শিকার হয়েছে বঞ্চনার। আজ থেকে শত বছর পূর্বে নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া নারীদের অসহায়ত্বের কথা ভেবে নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি লিখেছেন "...আমরা সমাজেরই অর্ধ অঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে?..." "পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে– একই। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই।" অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান পুরুষের চেয়ে অনেক পেছনে বলেই বেগম রোকেয়া পুরুষদেরকে নারীর প্রতিপক্ষ না ভেবে বরং নারীরা যেন পুরুষদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে পারে সেই স্বপ্নই দেখেছিলেন। তিনি সমাজে নারীর জন্য একটি সম্মানজনক আসন তৈরির চেষ্টা করেছেন। বদলে গেছে আজকের প্রেক্ষাপট। নারীরাও স্বপ্ন দেখছে। তারাও জেগে উঠছে কর্মমুখর জীবনযাপনের জন্য। নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত হয়। এ সত্যটি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন বলেই আমাদের জাতির পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদে নারী-পুরুষের সমান অধিকার দিয়ে গেছেন। তিনি নারীর ক্ষমতায়নের যে শুভসূচনা করেছিলেন, তাঁর সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে সমাজের সকল স্তরে নারীর অংশগ্রহণ আজ দৃশ্যমান। নারীদের ক্ষমতায়ন চিত্র আজ বিশ্বে রোল মডেল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ নারীশিক্ষার আশাতীত সাফল্য লাভ

করেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। মাতৃমৃত্যু হার কমেছে। নারীরা আজ অগ্রসর। নারীর ক্ষমতায়নে জনকল্যাণমুখী কর্মপরিবেশ গড়ার মধ্য দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ হয়ে উঠেছেন বিশ্বনেতা। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে পৌঁছেছে।

তবুও নারীর পথ চলা কন্টকাকীর্ণ। কখনো কখনো বাধা আসে। এই বাধা অতিক্রম করতে হবে। চলার পথকে আরো মসৃণ করতে হবে। এই প্রত্যয় নিয়ে সমাজের সর্বস্তরের নারীর অধিকার ও নারীর প্রাপ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক। ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে এই নেটওয়ার্কের যাত্রা শুরু। বাংলাদেশে কর্মরত সিভিল সার্ভিসের সকল নারী কর্মকর্তাদের একটি মর্যাদাকর অবস্থানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এটি একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। নারীর স্বাস্থ্য-শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জেন্ডার সাম্য ও বৈষম্যহীন কর্ম পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এই সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে।

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের 'স্বজন' সাহিত্য সাময়িকী প্রতিবারের ন্যায় এবারও প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যার প্রতিটি লেখাই এ সংগঠনের সদস্যদের। নেটওয়ার্কের সভাপতি সুরাইয়া বেগমের উৎসাহ ও দিকনির্দেশনায় প্রকাশনায় যুক্ত সকল সহকর্মীর শ্রমের ফসল এই প্রকাশনা সব পাঠকের মন জয় করুক এই প্রত্যাশা রইল। একইসঙ্গে এই স্মরণিকা ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং মুদ্রণ প্রমাদ, যা এড়ানো সম্ভব হয়নি– তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।

সবার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

নাছিমা বেগম
সরকারের সাবেক সচিব

তৃষিত হৃদয়

ড. শাহিদা আকতার

তৃষিত হৃদয় বারবার ছুটে যেতে চায়
আজন্ম লালিত সেই স্বপ্নের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলায়।
প্রিয় স্বদেশকে ভুলতে পারি না এ প্রবাস জীবনে
নিশিদিন সে তো চির জাগরূক এই তৃষিত মনের গহীনে।
প্রিয় বাংলার সবুজ ধানের ক্ষেতে দুরন্ত বাতাসের ঢেউ
প্রাণ জুড়ানো ভালো লাগার আবেশ ভুলতে পারে কি কেউ?
রোদেলা দুপুরে শান্ত পুকুরে মাছরাঙা দেয় ডুব
গাছের ছায়ায় রাখালের বাঁশি লাগে ভাল খুব।
শহুরে নিত্যদিনের কোলাহল আর মানুষের সরব মিছিল
কতই না প্রাণোচ্ছল, মমতা মাখা আর ভালবাসাময় বর্ণিল।
প্রাণহীন এই নিরেট কংক্রীটের শহরে
মানুষ কেবল রোবটের মত স্বয়ংক্রিয়ভাবে নড়ে চড়ে।
পরবাসের নিঃসঙ্গ জীবনে একাকিত্ব আর না পাওয়ার বেদনা
মনের মাঝে প্রত্যাশার স্বপ্ন ডেকে বলে তুমি আর কেঁদো না।
'সূর্যোদয়ের দেশে' মনের সূর্য কখনও দেয় না উঁকি
আলো ঝলমল তবু ভোরের সোনালী সূর্যকে কুয়াশাচ্ছন্ন দেখি।
বিরহী মনের রাশিরাশি অশ্রুজল তুষার আর বরফ হয়ে জমে
বিষন্ন মনকে তবু রাঙিয়ে তুলি চেরি ফুলের রঙিন মৌসুমে।

কবি পরিচিতি
ইকনমিক মিনিস্টার
বাংলাদেশ দূতাবাস, টোকিও, জাপান।

অতি সাধারণ

শাহিনা খাতুন

নরম বিছানা ধবধবে চাদর
দু'দুটো টেলিভিশন
টেলিফোন এয়ারকন্ডিশন মাইক্রোওভেন
কমতি নেই কিছুর
কিছু ডলারও আছে সাথে
চাইলে ঘুরে আসা যায় কোথাও।
মনোলোভা প্রকৃতি আর
পরিপাটি হয়ে আছে রাস্তাঘাট
উদ্যানে বসতে চাইলে
পাতারা পাখিরা পোকারা
আনন্দে একসুরে গাইতে সুরু করবে হয়তো
বসতে ইচ্ছেও করেছে বার কয়েক।
বেশ কয়েকদিন ডাকফাইল
ইন্টারকমে সালাম বিনিময়
চিঠিপত্র লেখা এগুলো দিয়েছি ছুটি।
হন্তদন্ত হয়ে অফিসের পথে ছোটা
রাস্তারে গালি দিতে দিতে প্রতিদিন
দেরি করে অফিসে পৌঁছে
দিনের কাজ দিনেই শেষ করার
প্রাণান্তকর চেষ্টার এই যে টানাটানির
বড় সাধারণ জীবন
আহারে আমার অতি সাধারণ জীবন!
কে বলেছে আমি ভাল নেই?
অযুত নিযুত কোটি বছরের
এই যে মর্তধাম
আমার কোন চিহ্ন রাখবেনা জানি
ধুলোর মত তুচ্ছ আমি
হারিয়ে যাবো অজানার দেশে
আমি বাঁশি নই
আমার সুর নেই
আমি নদী নই

আমার কলতান নেই
আমি সমুদ্র নই
আমার গর্জন নেই
আমি বাগান নই
আমার বৃক্ষ ফুল পাতা নেই
আমি নগন্য এক গোলাম
আমার কোন সময় নেই।
ভৃত্যের পায়ে দাগ আছে
আমি দাগ নিয়ে জন্মেছিলাম
আমার পূর্বপুরুষেরা ক্ষত নিয়ে চলে গেছে
আমিও তেমনি চলে যাব।
বিশ্বাস কর আমাদের কোন পানশালা নেই
একটুখানি নিদ্রার জমি
নদীর ভাংগনে চলে গেলে
আমরা এখনও পথেই থাকি
পথেই মরে যাই।
আমাদের অনেকগুলো সমুদ্রতট নেই
অত মনোরম নির্জন মাঠ নেই
অত সাজানো দিন আমাদের নেই।
তবুও বলি অতি সাধারণ চেনা শহরে
রাতে বাউল ফকিরের গান আছে।

কবি পরিচিতি
উপসচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।

দুরত্ব

শেখ মোমেনা মনি

আমি শিরীষ ছায়াদের
গায়ে মেখে হেঁটে যাই
আর দূর থেকে তোমার
অস্পষ্ট অবয়ব কল্পনা
করে ভাবি
একদিন দুজনের তুমুল
পদচারণা ছিল
এই পথে এই মাঠে,
এ পথে তোমার সাথে
আর হাঁটা হবেনা।
যে তুমি আমাকে
ভুলে গেছো
সেই তোমার জন্য
বুকের ভেতর
জোছনা পুষে রাখব না
বৃষ্টির পরে রংধনু রঙে
আকাশ রাঙাবো না!
একদিন আমিও ঠিকঠাক
ভুলে যাওয়া শিখে যাব
মনে রেখো ভালবাসলে
অভিমান ও বড় তীব্র হয়।
সেদিন আর কেউ
ভালবেসে কষ্ট পাবে না বলে
তুমি যেন নীলকণ্ঠ হয়ো না।

কবি পরিচিতি
উপসচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

বসন্তের বৃষ্টিতে.....দূরবর্তী তোমায়

নাঈমা হোসেন

ফাল্গুনী রাতে হঠাৎ বর্ষায়
ডুবে যাচ্ছে এই ধুলির-নগর;
জল-ভেজা নিয়নের মায়াবী আলোয়
অপরূপা আমার প্রাণের শহর!!
ঝরে পরা পাতায়
যেন জীবনের সঞ্চার...
বসন্তের উন্মনা বাতাস পেরিয়ে
ভেসে আসা সোঁদা মাটির ঘ্রাণ....
ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেন আমায়
ফেলে আসা হারানো কোনো ক্ষণে
বসন্ত-বর্ষার পলাশ-কৃষ্ণচূড়া দিনে!!
তোমাকে ভুলেছি আমি বা
আমায় ভুলেছো তুমি... বহুদিন;
জীবনের তানপুরায় বাজেনি সুর
আর কোনোদিন!!
আজ বহু বহুদিন পরে
বসন্তের উদাসী বৃষ্টির ছোঁয়ায়
ফিরে এলো আমার নীলাভ অতীত
মনে পড়ে গেলো সব স্মৃতি
"দূরবর্তী" তোমার!!

কবি পরিচিতি
উপসচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

মাকে ভালবাসিস

ড. আসমা বেগম

দিবসের ফ্রেমে মাকে বেঁধো নাকো
বয়স বেলায় মাকে তোমার সঙ্গে রাখো।
শিশুর মত মায়ের যত চাওয়া পাওয়া
তোমার হাতে যত্নে দিও তাহার দাওয়া।
চঞ্চল সে পা দুখানা শক্তি হারায়
যেই পা দিয়ে তোমার তরে হাটত ত্বরায়।
শপথ এখন তাহার সকল চলার গতি
বলতে গেলে তিনি এখন শিশু অতি।
তাঁর হৃদয়ের দুয়ার ভাঙ্গা উষ্ণ পরশ
তোমার মনে দিত সদাই সতেজ হরষ।
কষ্ট পেলে মা জননীর উদার সে বুক
তোমার মনে আনত বয়ে স্বর্গীয় সুখ।
যদিও বা করছে শাসন তোমার ভাল লাগি
ঘুমাননি মা খাবার দিছেন রাত্রি জাগি জাগি।
অসুখ হলে খোদার কাছে চাইতো মা আশীষ
ওষুধ, সেবা, পথ্য দিয়ে ব্যস্ত অহর্নিশ।

তোর শরীরে বয়ে চলা তিব্র গতির রক্তস্রোত
মার শরীরের উষ্ণধারা পারবি দিতে তাহার শোধ?
ঘুরল যখন দিনের চাকা মা হল তোর শক্তিহীন
জীবন দিয়ে করিস সেবা শুধিস তাহার রক্তঋণ।
করিসনে তোর মাকে কভু আশ্রমের ঐ দ্বারমুখী
বৃদ্ধা মাকে সাথে নিয়ে সন্তান থাক আজ সুখী।
বয়সী চোখের লোনা জল আর তাহার দীর্ঘশ্বাস
কুড়োসনে তুই নিজের তরে নিঠুর সর্বনাশ।
কষ্ট হলেও মাকে নিয়ে তুষ্ট চিতে থাকিস
কদিন পরে নিজের পালা সেইটি মনে রাখিস।
কবুল হজের সওয়াব পাবি মায়ের পানে চেয়ে
খোদার রহম নামবে জানিস সপ্ত আকাশ বেয়ে।
অবহেলি আপনা মাকে ঠেলিস নাকো দূরে
ছোট্ট শিশুর মতরাখিস নিজের বাহুডোরে।
প্রতিটি দিন মাতৃদিবস ভাবনা মনে রাখিস
তোর হৃদয়ের আগল খুলে মাকে ভালবাসিস।।

কবি পরিচিতি
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তিতুমীর সরকার কলেজ।

মানবিক সমাজ

ড. আলেয়া পারভীন

আমি মানুষ, আমি নারী,
অনেক কিছুই করতে পারি।
করতে পারি বিশ্ব জয়,
আমার নাই কোনো ভয়।
সমাজের ময়লা-আবর্জনা যত,
করবো সাফ সময়মত।
করো যত্ন আমায় শিশু থেকে,
সকল কাজে-কর্মে, সামাজিকীকরণে।
দৃষ্টি দাও সম সকল শিশুরে, উদার কর চিত্ত,
তবেই না হবে সমাজ আমার, মানবিকে বিত্ত।

কবি পরিচিতি
সহযোগী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
সরকারি সংগীত কলেজ, ঢাকা।

বিশ্ব সকলের

আফরোজা নাছরীন

ভূমিষ্ঠ হয়েই শুনেছিলে
'ও মা ! এ তো কন্যা,
পুত্র নয়।'
বইতে হবে এর বোঝা,
সোজা কথা নয়।
জন্মের অধিকার -
সজোরে চিৎকার,
দিয়েছিলে তুমি,
পাওনি তো ভয়।
সেই থেকে অদ্যবধি
চলছে জীবন নিরবধি।
পূর্বে-পশ্চিমে-উত্তরে-দক্ষিণে
উর্ধ্বে-নিম্নে-ভূমিতে-গগণে,
সবখানেই শুনেছো তুমি -
কন্যা-মেয়ে-স্ত্রী-নারী,
যোগ্যতায় তুমি যাবে না
কখনো অন্যকে ছাড়ি।
ছিলে নিশ্চুপ,
যদিও বহুদিন বহু সময়
হয়েছিলো বিরূপ।
তবু ও তোমার ধৈর্য্য-নিষ্ঠা কর্ম
সময় এ সকলকেই দিয়েছি অধিক মর্ম।
তাইতো, সময় যখন উজাড় করে
প্রতিটি নিমেষ, ক্ষণ, মুহূর্ত
দিয়েছে তোমার নিষ্ঠার তরে,
তখন কি তুমি আর
ভয় পাও পিছিয়ে পরার ?

বুকে নিয়ে প্রত্যয়
বন্ধুর রাস্তায় হও নির্ভয়,
বলছে সময় -

হবেই তোমার জয় নিশ্চয়।
কি বিস্ময় !
তোমার বোঝা বইবার ভার
আজ তোমারই হয়।
যোগ্যতায়-প্রজ্ঞায়-শ্রদ্ধায়
তুমি ও কম নয়।
বুঝি আজ তোমার ও
ভূমিষ্ঠ হবার মতোই
চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয়-
'ভালোবাসো আমাদের
একসাথে গড়ি চলো-
সুন্দর এই বিশ্ব সকলের।'

কবি পরিচিতি
সহকারী অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা
সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল

"জীবন নদী"

জান্নাতুল বাঁকিয়া

জীবন বহতা নদী
চলছে চলবে,
যেখানে যেমন
নিয়ে তার গতি।
বেঁচে থাকার যাদুর লড়াই
চলছে যেন সদাই।
তুমি চল, আমি চলি
পিছনে ফিরে নাহি বলি
ডাকছ কেন আমায়।
আধাঁর কেটে যাবে যখন
বলবো সকাল বেলা
এই ছিল বাঁচার লড়াই
আমার পথ চলা।

কবি পরিচিতি
সহকারী অধ্যাপক (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)

এসো, গল্প করি-

জান্নাতুল ফেরদৌস

মেয়ে, এসো গল্প করি।
তবে, আহ্লাদের গল্প আমার ভালো লাগে না।
তুমি কত তীব্র সুন্দরী,
কেমন তুলতুলে ছোট্ট মিষ্টি চড়ুই ছানাটি,
কেমন আধোআধো বোলের ময়না পাখিটি,
তোমার বাবা-মা, ভাই-বোন, জীবনসাথী তোমাকে কত্তো ভালোবাসে,
ভালোবেসে এতো দামী দামী লিপস্টিক কিনে দেয়,
এতো দামী হীরার দুল কিনে দেয় যে ওই টাকায় আমার দেশের গরীব মানুষের দুইমাস সংসার চলবে--
সেই গল্পও আমার ভালো লাগে না।
তোমার সুমধুর কণ্ঠে সমাজের শিখিয়ে দেওয়া জবাব যা তুমি তোতা পাখির মতো মুখস্থ আউড়ে যাও,
আমার ভালো লাগে না।
মেয়ে, এসো গল্প করি।
না, বিয়েতে তোমার ২৫টি কাতান শাড়ি পাবার গল্প আমি আরেকদিন শুনবো।
আজ আমি শুনতে চাই তোমার সংগ্রামের গল্প।
আমাকে বলো, সমাজ সংসার পরিবারের নিষেধ না শুনে নিজের মনের কোন কথাটি তুমি শুনেছো?
পরিবার অনার্সের আগেই বিয়ে দিতে চাওয়াতে তুমি আপত্তি করে ডিগ্রি নিয়েছো,
তোমার সেই সফলতার গল্প আমাকে বলো।
তোমার মনের জোর, তোমার মাথার জোর আমাকে দেখাও।
কতো কষ্ট করে, কতো অপেক্ষা করে নিজের স্বপ্ন তুমি নিজে পূরণ করেছো সেই গল্প আমাকে শোনাও।
বলো, তুমি ছবি এঁকেছো, ভাস্কর হয়েছো, ড্রাইভার হয়েছো, বিজ্ঞানী হয়েছো, গান গেয়েছো।
সমাজের ভ্রুকুটির তোয়াক্কা না করে তোমার নূপুর রুমঝুম বেজে তোমার স্বপ্নকে সুরেলা করেছে- সেই অনুভূতি আমাকে বলো।
না, হেরে যাওনি তুমি অনর্থক শাসনের নাগপাশে,
অসময়ের যে বিয়ে তোমার জীবনে বন্ধন বেড়ী হয়ে তোমাকে আটকাতে চেয়েছে,
লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে চেয়েছে,
স্বপ্ন পূরণের বদলে তোমাকে দাসী বানাতে চেয়েছে--

সেই বন্ধন ছিন্ন করে দূর বহুদূর তুমি এগিয়ে এসেছো,
সেই অত্যাশ্চর্য সাফল্যের গল্প আমাকে শোনাও।
আমি মনোযোগ দিয়ে শুনবো।
না, তোমার স্বামী তোমাকে প্রতিমাসে ম্যাকলিপস্টিক উপহার দেয় কিনা আমি জানতে চাইনা।
আমি জানতে চাই, মেয়ে, তুমি পারোতো নিজের শখ নিজে পূরণ করতে?
নিজের জীবন নিজে চালাতে?
ধরো, যদি তোমার শখ হয় কালো একটি বাইক কিনবে,
বালি দ্বীপে ঘুরতে যাবে,
নিজের নামে এক টুকরো জমি রাখবে,
নিজের মায়ের চিকিৎসা করাবে?
পারবে তো, মেয়ে?
সেই সাহসী সক্ষমতার গল্প আমাকে বলো,
অন্যের টাকা - অন্যের সাহস - সেটা অন্যেরই।
সেই সাহসে সাহসী হবেনা তুমি, তোমার নিজের সাহসটা আমাকে দেখাও।
আমি জানি, তোমার কতো বাধা,কতো সমস্যা।
সেই বাধ ভাংগার গল্পটা আমাকে শোনাও।
তুমি নিজের দুইহাতে এই সুন্দর পৃথিবীর কি কি অর্জন করেছো, সেই সংগ্রহ আমাকে দেখাও।
আমি আগ্রহ নিয়ে দেখবো।
মেয়ে, এসো গল্প করি।
কেউ চায়নি, সবাই আটকাতে চেয়েছে, নিষেধ করেছে।
তবুও তুমি নিজের স্বপ্ন পূরণ করেছো, নিজের জীবন নিজের হাতে গড়েছো-- সেই গল্প আমাকে শোনাও।
আমি মন ভরে শুনবো।
আমি তোমার সাথে গল্প করবো বলে আকুল হয়ে বসে আছি।
মেয়ে, এসো গল্প করি।

কবি পরিচিতি
প্রভাষক(উদ্ভিদবিজ্ঞান)
সরকারি আদমজীনগর এম ডব্লিউ কলেজ, নারায়ণগঞ্জ।

স্থানীয় সরকার ও তৃণমূলে নারী নেতৃত্বের বিকাশ

নাছিমা বেগম, এনডিসি

পটভূমি

আজ থেকে শত বছর আগে সকল কাজে নারীর অংশগ্রহণ ও নারীর নেতৃত্ব বিকাশের স্বপ্ন দেখেছেন নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া। তিনি ১৯০৫ সালে তার 'সুলতানার স্বপ্ন' রচনার মাধ্যমে নারীর শিক্ষা-দীক্ষা, গবেষনা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি নারী শাসকের যোগ্য নেতৃত্বে শাসনকায্য পরিচালনার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যার বাস্তব রূপ আজ আমাদের সামনে দৃশ্যমান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেগম রোকেয়ার স্বপ্নদেখা দৃঢ়চেতা নারী শাসকের প্রতিচ্ছবি।

বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। আমরা সকলেই জানি যে, এই বিপুল সংখ্যক নারীকে উন্নয়নের মূলস্রোত ধারার বাইরে রেখে রাষ্ট্রের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়নের মূল ভিশন হল এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে নারী ও পুরুষ, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্র সমান সুযোগ ও অধিকার লাভ করবে। মৌলিক অধিকারসমূহ ভোগের ক্ষেত্রে কোন ধরণের জেন্ডার বৈষম্য থাকবে না। নারী পুরুষের সাথে সমান তালে কাজ করবে এবং রাষ্ট্র ও গণজীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডে পুরুষের পাশাপাশি সমভাবে অংশ নেবে।

নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূর করে তাদেরকে উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারে পরিণত করার জন্য নারী নেতৃত্ব বিকাশের কোন বিকল্প নেই। সরকার নারীর সার্বিক উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার সূচনালগ্ন থেকেই নারীর নেতৃত্ব বিকাশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সরকারের গৃহীত বিভিন্ন নারীবান্ধব পদক্ষেপ নারীর নেতৃত্ব বিকাশে ইতিবাচক অবদান রাখে। সরকারী চাকুরিতে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীদের জন্য কোটা সংরক্ষণ করা হয়। তাই সরকারী চাকুরীতে ক্রমান্বয়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাচ্ছে।

নারী-পুরুষ সমতা ও নারীর নেতৃত্ব বিকাশে সাংবিধানিক ব্যবস্থা:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদের অধীনে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

৯ অনুচ্ছেদ আলোকে 'রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠান

সমূহের কৃষক শ্রমিক এবং মহিলাদের যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।'

১০ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।'

নারী-পুরুষের সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সংবিধানের ১৯(১) অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে, 'সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।'

১৯(২) অনুচ্ছেদে রয়েছে, 'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুসম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।'

সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার হিসেবে নারী-পুরুষের সমঅধিকার দেয়া হয়েছে।

২৭ অনুচ্ছেদে রয়েছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।'

২৮(২) অনুচ্ছেদে রয়েছে, 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।'

২৮(৪) অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে, 'নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।'

২৯(১) অনুচ্ছেদ আলোকে 'প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।'

২৯(৩)(ক) অনুচ্ছেদে 'নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।'

৬৫(৩) অনুচ্ছেদে নারীর জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং ৬৫(২) অনুচ্ছেদের অধীনে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত ৩০০ আসনে নারীর অংশগ্রহণে কোন প্রতিবন্ধকতা রাখা হয়নি।

সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ গুলো থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, নারীর অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার রয়েছে।

নির্বাচন কমিশনে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের অন্যতম শর্ত হিসেবে ২০২০ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিতে শতকরা ৩৩ ভাগ আসন নারীদের জন্য বরাদ্ধ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু

সরকারের আমলে নারীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিকাশের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তার সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের নারীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের অগ্রযাত্রা আজ সারা বিশ্বে প্রশংসনীয় অবস্থানে রয়েছে।

স্থানীয় সরকারে নারী প্রতিনিধিত্ব: স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী নেতৃত্ব বিকাশে ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ এবং সিটি করপোরেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মূলতঃ স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য এ পরিষদসমূহ নির্বাচিত জনপ্রতিধিদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। সংবিধানের তয় পরিচ্ছেদে স্থানীয় শাসন পরিচালনার বিষয়ে ৫৯(১) অনুচ্ছেদে 'আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হয়।'

মাঠ পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিত্বে নারীর সম্পৃক্ততা সৃজনের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের সুযোগ রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার তৃণমূল পর্যায় হলো ইউনিয়ন পরিষদ। এতে বিভিন্ন সময়ে সরকারের নেয়া নানা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তিনটি সংরক্ষিত আসনের সদস্য পদে নারীদের সরাসরি নির্বাচনের বিধান রাখা হয়। যা পূর্বে মনোনয়নের মাধ্যমে করা হতো। এ ক্ষেত্রে একটি ইউনিয়ন পরিষদের ৯টি ওয়ার্ড থেকে ৯ জন সাধারণ সদস্য এবং তিনটি ওয়ার্ড মিলে একজন নারী সদস্য অর্থাৎ ৯টি ওয়ার্ড এর মধ্যে সংরক্ষিত আসনে ৩ জন নারী সদস্য নির্বাচিত হবার নিয়ম রয়েছে। ১ জন চেয়ারম্যান, ৯ জন সাধারণ সদস্য এবং ৩ জন সংরক্ষিত নারী সদস্য মোট ১৩ জন সদস্য এরা প্রত্যেকেই স্থানীয় ভোটারদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। নির্বাচিত এই প্রতিনিধিবৃন্দ সরকার এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এই যে জনরায় এবং জনগণের সরাসরি ভোট এটি হলো জাতির গণতান্ত্রিক মন-মানসের প্রতিচ্ছবি। একইভাবে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশন আইনকে যুগোপযোগী করে নারীর সংরক্ষিত আসনের বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই আইনের ৩(২) ধারায় সংরক্ষিত আসনে সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একটি ইউনিয়নকে তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করতে হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে ।

ইউনিয়ন পরিষদ আইন ১০(১) ধারায় ইউনিয়ন পরিষদের গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ইউনিয়ন পরিষদ ১ জন চেয়ারম্যান ও ১২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে, যাদের ৯ জন সাধারন আসনের সদস্য ৩ জন সংরক্ষিত আসনের সদস্য হবেন ।

১০(৩) ধারায় প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য তিনটি আসন সংরক্ষিত থাকবে যা সংরক্ষিত আসন বলে অভিহিত হবে। উক্ত সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণ আইন ও বিধি অনুসারে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

তবে মহিলাগণের ১০(১) উপধারার বিধান অনুসারে সাধারণ নির্বাচনে পুরুষ প্রার্থীদের ন্যায় সরাসরি অংশগ্রহণে কোন বাধা থাকবে না।

একইভাবে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা ও জেলা পরিষদ আইনেও মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১১টি সিটি কর্পোরেশন, ৩৩০টি পৌরসভা ৪৯২ টি উপজেলা এবং ৪৫৫০ টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলরের এক তৃতীয়াংশের সমসংখ্যক আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। প্রত্যেক পৌরসভার প্রতি ৩টি ওয়ার্ডের জন্য ১ জন নারী কাউন্সিলর পদ সৃষ্টি করা হয় এবং এসকল পদে নারীগণ নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলরের এক তৃতীয়াংশ আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। উপজেলা পরিষদে ১ জন নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। জেলা পরিষদে ৫ জন নারী সদস্যের আসন সংরক্ষিত রয়েছে।

উল্লিখিত আইন সমূহে যে কোন নারীর সংরক্ষিত আসন ব্যতিত অন্য পদে সরাসরি নির্বাচনে পুরুষ প্রার্থীদের সঙ্গে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ৩৪ জন নারী ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন ৬ জন নারী। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনে ২০১১ সালে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি পরবর্তী মেয়র নির্বাচনেও নারায়ণগঞ্জের মেয়র হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে ঢাকা জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে একজন নারী দায়িত্ব পালন করছেন।

পুরুষ জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং উপজেলা পরিষদের এই নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিগণ স্থানীয় নারী উন্নয়ন এবং তাদের অধিকার রক্ষার পাশাপাশি এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছেন। মাঠ প্রশাসনে আমার দীর্ঘ ১৯ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে ১৯৯২ থেকে ২০০১ সন পর্যন্ত প্রায় এক দশকে আমি ২টি পৌরসভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ২টি উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছি। দায়িত্ব পালনকালে লক্ষ্য করেছি তৃনমূল পর্যায়ে নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে অনেকের মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষতার অভাব রয়েছে। অনেকেই তাদের উপর অর্পিত বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচী নিজেরা বাস্তবায়ন না করে তাদের স্বামী বা পুত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেছেন। আবার ক্ষেত্র বিশেষে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এবং সামাজিক কুসংস্কার ও বৈষম্যের কারণে তাদের এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ডে কার্যকর

ভূমিকা পালনে যথেষ্ঠ বাধার সম্মুখিন হতে হয়েছে। সামগ্রিক উন্নয়নে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো এখন সময়ের দাবী।

নারী উন্নয়ন ফোরাম: আমরা জানি নারী উন্নয়ন ফোরাম ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং উপজেলা পরিষদের নারী জনপ্রতিনিধিদের সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি ও তাদের অধিকার রক্ষা এবং নেতৃত্ব বিকাশে প্রতিষ্ঠিত একটি প্লাটফরম। এই ফোরাম স্থানীয় প্রশাসনে দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যদের মাধ্যমে সমাজে নারীর ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিষদে তাদের ভূমিকা আরও জোরালো করছে। নারী নেতৃত্ব বিকাশের উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমানে নারী উন্নয়ন ফোরাম উদ্যোগী ভূমিকা রাখার ফলে নারী নেতৃত্ব বিকাশে বাংলাদেশে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে নারী উন্নয়ন ফোরাম গঠিত হয়-

* ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং উপজেলা ও জেলা পরিষদে সামগ্রিক কার্যক্রমে নারী সদস্যদের ভূমিকা জোরদার করা;
* সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জেন্ডার সংবেদনশীল করা;
* অন্যান্য নাগরিক সংগঠনের সাথে নেটওয়ার্কিং ও যোগাযোগ স্থাপন করা;
* পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমে জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও জেন্ডার সমতায় ভূমিকা রাখা;
* সমাজে পিছিয়ে পড়া অংশ হিসেবে নারীর সামগ্রিক উন্নয়ন ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখা;
* স্ব স্ব পরিষদ বা কাউন্সিলে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য স্থানীয় সরকার আইন-কানুন ও কার্যক্রম ভালভাবে অবহিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে নারীর স্বপক্ষে আইনী সংস্কারে অবদান রাখা।

নারী উন্নয়ন ফোরামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে নারীদের নেতৃত্ব দেয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন ফোরাম এমন একটি কার্য পরিবেশ তৈরী করছে, যার মাধ্যমে এলাকার চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে নিজেদের এবং এলাকার নারীদের জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে অবদান রাখছে। নারী উন্নয়ন ফোরামের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো:-

উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি
নারীদের দক্ষতা ও নেতৃত্বের বিকাশ
নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ
নারীর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান সৃষ্টি

নারী উন্নয়ন ফোরামের বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহের মাধ্যমে নারী নেতৃত্বের বিকাশে তৃণমূলের নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে। পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সমূহের রয়েছে বহুমুখী কার্যক্রম। তৃণমূলে নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমেই সরকার কার্যতঃ নারী নেতৃত্ব টেকসই করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রাসঙ্গিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহের মধ্যে রয়েছে-

উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ: দারিদ্র বিমোচনের মূল চালিকা শক্তি হলো কর্মসংস্থান। ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা হচ্ছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় প্রবৃদ্ধি সহায়ক অবকাঠামো, যেমন গ্রোথ সেন্টার, গ্রামীণ হাট-বাজার, নারী বিপণী কেন্দ্র, ঘূর্ণিঝড়-বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র ইত্যাদি উন্নয়নে নারীদেরও সম্পৃক্ত করায় প্রায় ৪৩.১১ শতাংশ নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এসএমই ঋণ: সরকার নারীদের ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নারী উদ্যোক্তা সৃজনে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক small and medium enterprises (এসএমই) ঋণ প্রাপ্তির সুবিধার্থে নারী উদ্যোক্তাদের গ্রুপভিত্তিতে এসএমই ঋণ প্রদানের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ও শাখা পর্যায়ে নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে ডেডিকেটেড ডেস্ক খোলা হয়েছে। ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনা জামানতে লোন প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন পুনঃ অর্থায়ন স্কিমের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের হ্রাসকৃত সুদহার, এসএমই ঋণ প্রদানের নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

তৃণমূলে মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচি যেমনঃ সেলাই, ব্লক বাটিক, গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগী পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মৎস্য চাষ, নার্সারী, ভার্মি কম্পোস্ট বিউটিফিকেশন ফ্রন্ট ডেস্ক ম্যানেজমেন্ট, ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর, ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৮টি দফতর, সংস্থা থেকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিউসিসিআই): বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান, ব্যবসা সম্পর্কিত তথ্য সহায়তা, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সহায়তা, ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে নেটওয়ার্ক ও অংশীদারিত্ব তৈরীর কাজ করছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ২৫,২৯০ জন নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। যার ফলে প্রশিক্ষিত নারী উদ্যোক্তাগণ অত্যন্ত সফলতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা সহ অন্য নারীদের ব্যবসায় উৎসাহ ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে অবদান রাখছে।

জয়িতা ফাউন্ডেশন: নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে গড়ে উঠা বিভিন্ন নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা বিপণন এবং বাজারজাতকরণে পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী নারী বান্ধব অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং বিদেশে বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঢাকার ধানমন্ডিতে জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ করা হচ্ছে। বর্তমানে ঢাকাস্থ রাপা প্লাজায় 'জয়িতা' নামক বিপণন কেন্দ্রে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মহিলা সমিতির উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারজাতকরণের সুবিধা রয়েছে। এটি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি অনন্য প্রয়াস। এর মাধ্যমে তৃণমূল অঞ্চলের নারী উদ্যোক্তারা রাজধানীর বাজারে প্রত্যক্ষভাবে প্রবেশ করতে সক্ষম হচ্ছে। জয়িতা কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হলো:

(১) ক্রমান্বয়ে নারীদের বহুমূখী ব্যবসায় অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে সারাদেশে নারী বান্ধব মার্কেটিং নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা;

(২) বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায় নারীদের নিয়োজিত করার লক্ষ্যে তাদের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা;

(৩) নারীদের ব্যবসায় অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যে অনুকূল এবং উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়তা করা;

(৪) সফল নারী উদ্যোক্তা গড়ে তোলা এবং রোল মডেল হিসেবে তাদের তুলে ধরা।

নারী নেতৃত্ব বিকাশে সরকারের বিভিন্ন আইন, নীতি, আন্তর্জাতিক সনদ এবং কর্মপরিকল্পনা:

নারীর অধিকার সুরক্ষা, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারের বিভিন্ন আইন, নীতি প্রণয়ন করেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘোষনায় সমর্থন ও অনুসমর্থনের মাধ্যমে সরকার বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনাও বাস্তবায়ন করছে।

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা- ৫ এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও এতদবিষয়ক কর্মপরিকল্পনা তৃণমূল পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তৃণমূল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিদের জন্য নারীর অধিকার সুরক্ষায় প্রণীত প্রাসঙ্গিক বিষয় সমূহ জানা অত্যন্ত জরুরী।

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০): সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা এবং নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক সনদ ও দলিলের উপর ভিত্তি করে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং সরকারের 'ভিশন ২১' কে সামনে নিয়ে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছিল। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপকল্প হচ্ছে - নারী উন্নয়ন এবং অধিকার সৃষ্টির মাধ্যমে এমন সমাজ গঠন যেখানে নারী এবং পুরুষ সমান সুযোগ পাবে এবং সকল মৌলিক

অধিকারসমূহ সমানভাবে ভোগ করবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নে নারীদের সমান অবদানের বিষয়টি স্বীকৃতি পাবে। এর অভিলক্ষ্য হচ্ছে নারীর অগ্রযাত্রায় আত্মনির্ভরশীলতা নিশ্চিতকরণ এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক প্রতিবন্ধকতা হ্রাসকরণ।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর ২২টি মূল লক্ষ্যের মধ্যে একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। যা নারীর নেতৃত্ব বিকাশে অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রদক্ষেপ সমূহ বাস্তবায়নে সরকারের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা রয়েছে:-

লক্ষ্যসমূহ:

১. রাজনীতিতে অধিকহারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যে প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

২. নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।

৩. রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে পর্যায়ক্রমে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

৪. নির্বাচনে অধিক হারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা।

৫. নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।

৬. রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা।

৭. জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা ও বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৮. স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সকল পর্যায়ে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

৯. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উচ্চপর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা।

নারী নেতৃত্ব বিকাশে নারী উন্নয়ন নীতি, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন, CEDAW, বেইজিং প্লাটফরম এর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় মূল ও সহায়ক দায়িত্ব পালন করছে। পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও রাজনৈতিক দলসমূহ এবং সুশীল সমাজ এলক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করছে।

উপসংহার: স্থানীয় সরকার ও তৃণমূলে নারীর নেতৃত্ব বিকাশে চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে সরকারের গৃহীত বহুমুখী কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে বিশ্বে নারীর ক্ষমতায়নের রোল মডেল হয়ে উঠছে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা, জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার কাজ এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারীর এই অগ্রযাত্রায় রূপকল্প-২০২১ এবং ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হবে। উন্নত ও মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বসভায় স্থান লাভ করবে।

পাদটীকাঃ ১০ মার্চ, ২০১৬ সনে স্থানীয় সরকার বিভাগের সহায়তায় কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসনের আয়োজনে নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলাসমূহের ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদের নারী জনপ্রতিনিধিদের সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে স্থানীয় সরকার ও তৃণমূলে নারী নেতৃত্বের বিকাশে কী নোট পেপারটি উপস্থাপন করা হয়।

তথ্যপঞ্জী

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২।
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৩।
- www.ec.org.bd, ২০ আগস্ট ২০১৫।
- জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন, ২০১৫-২০১৬।
- দৈনিক বাংলাদেশ সময়, ১৫ জানুয়ারি ২০১৫।
- The Representation of People's Ordinance (RPO), 2013.
- স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯, ৫(২) উপধারা।
- স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯, ৭ ধারা।
- স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) <span

লেখক পরিচিতি

সাবেক সচিব

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

জীবন্ত স্মৃতিসৌধ

মাজেদা রফিকুন নেছা, এনডিসি

স্বাধীন বাংলা বেতারের কয়েকটা জনপ্রিয় গান সুমধুর সুরে একের পর এক ভেসে আসছে রিসিপশন থেকে। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছে। এ যেন স্বর্গীয় সুর। শুধু শুনতেই ইচ্ছা করে। মনেই হচ্ছেনা এটা একটা ফিজিওথ্যারাপী সেন্টার। মনে হচ্ছে কোন সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র অথবা কোন সঙ্গীত চ্যানেল।

প্রতিদিনের মত আজও ফিজিওথ্যারাপী নিতে এসেছেন সোহানা ম্যাডাম। দীর্ঘদিন সরকারী কলেজে শিক্ষকতা করে সম্প্রতি অবসরে গেছেন। সবসময় এত হাসিখুশী থাকেন, এত সুন্দর করে কথা বলেন সবার সাথে, হেসে হেসে গল্প করেন, তাঁর উচ্ছলচঞ্চল আচরণ দেখে বোঝার উপায় নাই যে তাঁর অবসরের বয়স হয়েছে বা তাঁর কোন অসুখ বিশুখ কিংবা কোন কষ্ট আছে। অনেকের অনুরোধে মাঝে মাঝে সুমধুর কণ্ঠে গানও গেয়ে শোনান। আজও তিনি রিসিপশনে বসে গান গাচ্ছেন একেরপর এক, হয়তোবা কারও অনুরোধে। অপেক্ষমান রোগীরা তাঁর গান শুনে নিশ্চিন্তে- অনেকটা সময় স্বেচ্ছায় অপেক্ষা করে কাটিয়ে দিতে রাজী। তাড়াহুড়া করে থ্যারাপী নিতে ব্যস্ত হওয়ার থেকে বরং বসে বসে দুয়েকটা গান শুনতে কেউ আপত্তি করেনা। বরং ভালোইসময় কাটে তাদের।

সবার খুব পিচ্ছ মানুষ এই সোহানা ম্যাডাম। কলেজের শিক্ষিকা বলতেই যেন চোখের সামনে গম্ভীর একটা মুখ ভেসে উঠে। সোহানা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। সবার সাথে এমন ভাবে গল্প করেন যেন তাঁরা সবাই তাঁর শুধু অতি পরিচিতই নয়, অত্যন্ত আপনজন। সবাইকে তিনি নিষেধ করেছেন ম্যাডাম ডাকতে, কারণ আপা ডাক শুনতেই তাঁর বেশী ভাল লাগে। তবুও সবাই সোহানা ম্যাডাম বলেই ডাকে। সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান দেয়ার মাধ্যমে নিজেকেও সম্মান করা হয়।

সেদিন তিনি থ্যারাপী শেষে সেন্টার থেকে বের হতে যাবেন, এমন সময় গেট দিয়ে ঢুকছিল আমেনা। দরজার মুখে দুজনের দেখা। তাকিয়ে একটু চেনা মনে হয়, প্রথমে চিনতে কষ্ট হলেও পরে দুজন দুজনকে চিনতে পারে। বুকে জড়িয়ে ধরে থাকে দুজনে দুজনকে অনেকক্ষন। আনন্দে আবেগে যেন তাঁরা বাক্যহারা হয়ে যান। কলেজে বান্ধবী ছিলেন তাঁরা। এইচ,এস,সি পাশ করার পর বিয়াল্লিশ বৎসর পর এই প্রথম দেখা। দুজনে প্রাণ খুলে গল্প করতে বসে। সুখ দুঃখের গল্প হাসি মজা প্রাণবন্ধ আলাপ অনেকক্ষন চলে, যেন কারও কোন কাজ নেই, অখন্ড অবসর। আশে পাশের অপেক্ষমান অন্যান্যরাও উপভোগ করে তাঁদের গল্প। তাদের মজার মজার কথায় তারাও মজা পেয়ে হেসে উঠে, তাঁদের গল্পে সামিল হয়।

কথায় কথায় আমেনা তার নিজের সংসার ও ছেলেমেয়েদের গল্প করে। সে নিজে

বেশী লেখাপড়া করেনি, তবে পাঁচ ছেলে মেয়ে সবাই শিক্ষিত। কে কি পড়াশোনা করেছে, এখন কে কোথায় কি করছে, কার কোথায় বিয়ে হলো, কতজন নাতীনাতনি ইত্যাদি একটানা গল্প করতে করতে অনেকটা সময় পরে খেয়াল হয় যে সোহানা কিছু বলছে না। ওকে খুব বিষন্ন দেখাচ্ছে। কোন কথাই বলছেনা সে। কলেজে পড়ার সময় আমেনা জানতো খুব অল্প বয়সের বিধবা সোহানার একটা ছেলে ছিল। এক সময় আমেনা জানতে চায় ছেলেটা কোথায় আছে, কেমন আছে, কি করছে। হাসিখুশী সোহানা মূহূর্তে বদলে যায়। চোখের পানি বাধা মানেনা। আমেনা ভাবে সোহানার ছেলেটা বোধহয় মারা গেছে বা কোন সমস্যায় আছে। সেজন্য সে আর কিছু জিগ্যেস করে না।

সোহানাকে সবাই বিধবা জানলেও আসলে সে একজন বীরঙ্গনা যা কখনো কারও কাছে তা প্রকাশ করেনি বা কোন সুযোগ সুবিধা সরকার থেকে গ্রহন করেনি। কারন সরকার বা কারও কাছ থেকে পাওয়া কোন সুযোগ-সুবিধা, ভাতা, অনুদান বা কোনো কিছুই ওর ক্ষতিটা পূরন করতে পারতো না। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাক সেনারা বাসায় ঢুকে বাসার সব কিছু তল্লাসি-তচনচ-লুটপাট করে চলে যাওয়ার সময় খাটের নীচে লুকিয়ে থাকা স্কুলছাত্রী সোহানাকে দেখে ফেলে। জোর করে ওকেটেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে যায়। অসহায় বাবামার শুধু নির্বাক তাকিয়ে দেখা ছাড়া কিছু করার ছিল না। পরে অনেক দিন অনেক রকম চেষ্টা তদবির করেও তাঁরা মেয়েকে খুঁজে পাননি। স্বাধীনতার পর অনেক কষ্টে খুঁজে পান। মেয়েকে দেখে চেনার উপায় নাই। কোনো এক শত্রুর সন্তান গর্ভে ধারন করে সোহানার শরীর তখন পোড়া কাঠের মত। বেঁচে থাকলেও তাকে বাঁচা বলা যায় না।

মা চেয়েছিলেন গর্ভপাত করাতে, কিন্তু ডাক্তার রাজী হয়নি। কারন ততদিনে অনেক দেরী হয়ে গেছে এবং গর্ভবতী মায়ের জীবনের আশঙ্কা আছে তাতে। অগত্যা তাঁরা মেয়েকে বাঁচিয়ে নিজেদের সম্মান রাখতে সবাই মিলে ঢাকায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন যেখানে কেউ তাঁদের চিনেনা। সেখানেই সোহানার ছেলে সোহাগের জন্ম হয়। তখন থেকেই সবাই জানে যে সোহানা খুব অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে। সোহাগের জন্মের আগেই ওর বাবা মারা গেছে। সোহাগ ও তাই জানে।

বাবা মার আন্তরিক সহযোগিতায় সোহানা অনেক কষ্ট করে স্কুল, কলেজ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনাটা সার্থক তার সাথে শেষ করে এবং পরে কলেজে শিক্ষকতার চাকরী নেয়। সোহানা ও সোহাগ ছিল তাঁদের চোখের মনি। সোহাগ কে নিয়ে খুব আনন্দে দিন কাটছিল তাঁদের। কিন্তু তাঁদের অবর্তমানে মা-ছেলের কি হবে তা নিয়ে তাঁদের খুব দুশ্চিন্তাও ছিল। সোহানাকে বিয়ে দেয়ার অনেক চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু সোহানা রাজী হয়নি।

সোহানা রাজী হয়নি দুইটা কারনে। প্রথম কারন হলো যে পুরুষ মানুষ কে সে ঘৃনার চোখে দেখে। এক পুরুষ তার চরমক্ষতি করেছে, সেই জাতের আরেকটা লোক কে

সে কিভাবে বিশ্বাস করে বা ভালোবেসে বিয়ে করবে। দ্বিতীয় কারন হলো বাচ্চা। যদি কেউ তার বাচ্চার জন্মের কারণ জেনে গিয়ে তার অসম্মান করে সেই ভয়। সন্তানের জন্য ইতার আত্মত্যাগ।

দশ বৎসরের সোহাগকে রেখে নানা-নানী মাত্র সাত মাসের ব্যবধানে মারা গেলেন। তাঁরা যত দিন বেঁচে ছিলেন, স্কুলের সময় বাদ দিয়ে বাকী সময়টা সোহাগ তাঁদের কাছেই কাটাতো। তাঁদের কাছেই লেখাপড়া, গান-বাজনা, কবিতা আবৃত্তি, ধর্ম কর্ম শেখা ছাড়াও গল্প শোনা, মুখে মুখে ধাঁধা, মানসাঙ্ক, হাসি, কৌতুক, লুডু খেলাধোড়া ঘোড়া খেলা এগুলো খুব উপভোগ করতো সে।

তাঁদের মৃত্যুর পরে চাকরীর পাশাপাশি একা একা যথেষ্ট সংগ্রামের সাথে ছেলেকে মানুষ করেছেন সোহানা। সেই ছেলে সোহাগ বড় হয়েছে। লেখা পড়াশেষ করে বড় চাকরী করে। মা কে না জানিয়ে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছে বৌ ঘরে এনেছে। বিয়ের আগে জানানোতো দূরের কথা, বৌ ঘরে ঢোকানোর আগেও জানায়নি। মায়ের তো আর কেউ নেই। তাই ঝামেলা না বাড়িয়ে ছেলের পছন্দ কেই বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেয়। প্রথম থেকেই বৌয়ের আচরণ সোহানার ভাল লাগেনা। তবু মুখ বুজে সহ্য করে যায়। অনেক পরে জেনেছে মেয়ের বাবা একান্তরে স্বাধীন তার বিপক্ষে কাজ করেছে। সোহানার কিছু করার ছিলনা। সোহাগকেও কিছু জানতে দিত না সোহানা। শুধু মনে হয়েছে যে, ও তাকে কষ্ট করে মানুষ করলে ও শত্রুর রক্ত তার নিজের লোককে নিজের অজানেন্তেই খুঁজে নিয়েছে। একেই বলে নিয়তি।এটা এমনি এক কষ্ট যা কারও সাথে ভাগ করে নেয়া যায়না। আমেনার সাথে বসে বসে সব গল্প করলেও অসম্মানের অংশগুলো বাদ দিয়ে বলে।

সোহাগ বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে খুব ভাল আছে। মাকেও এতদিন সে ভালোবাসতো বলেই মনে হয়েছে। সব কিছু সত্বেও সবাই মিলে বেশ কাটছিল যতদিন সোহানা অবসরে যাননি। অবসরের পর তার আসল রূপ ধরা পড়ে। মায়ের এককালীন পাওয়া টাকাগুলো বুদ্ধি করে হাতিয়ে নিয়েছে সোহাগ। আর ছেলের বউ কাজের লোকদের বিদেয় করে মাকে দিয়েই সংসারের সব কাজ করাচ্ছিল। মুখে অবশ্য মিষ্টিমিষ্টি কথা বলতো। মা এত দিন কাজের মধ্যে ব্যস্ত ছিলেন, এখন একা একা ঘরে শুয়ে বসে কাটালে বোর হয়ে যাবেন, অসস্থ হয়ে যাবেন। তার চেয়ে একটু সাংসারিক কাজে কর্মে মন দিলে মার শরীর মন দুইই ভাল থাকবে। সে যা কিছু করছে সবমায়ের ভালোর জন্যই করছে। মুখে যাইই বলুক, তার উদ্দেশ্য ঠিকই বোঝা যায়।

সারা জীবন এতো কষ্ট করে ছেলে ও তার পরিবারকে এত যত্ন করে মানুষ করার ফল হিসেবে প্রাপ্য এই আঘাতটা সহ্য করতে না পেরে ষ্টোক করে ডান দিকটা সম্পূর্ণ অবশ হয়ে যায়। ঘরের এক কোনে অবহেলায় পড়েছিল। ছেলে বা বৌ কেউ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়নি বা চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করেনি। শুধু সংসারের

কাজের জন্য আবার কাজের লোক রাখতে হয়। কাজের লোকের মুখে প্রতিবেশীরা খবর পেয়ে দেখতে আসে তাকে। তারাই এই ফিজিওথ্যারাপী সেন্টারে তাঁকে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। প্রায় সাত আট মাসের চিকিৎসায় এখন কিছুটা ভালো। এখন তিনি নিজের সাজানো সংসার ছেড়ে মহিলা হোষ্টেলে থাকেন। মাসিক পেনশনের টাকা আর মাঝে মাঝে দুয়েকটা গানের অনুষ্ঠান ও টিউশনি করে সামান্য যা টাকা পান তাই দিয়েই জীবন ধারন করে চলেছেন। শুনে আমেনা চোখের পানি ধরে রাখতে পারেনা। এতক্ষন যারা গল্প শুনে আনন্দিত হচ্ছিলেন এখন সবার চোখেই পানি। অনেক দিন ধরে তাঁরা সোহানাকে চিনলেও এই সোহানাকে তাঁরা চেনেননা।

আমেনা একদিন মহিলা হোস্টেলে সোহানার সাথে দেখা করতে আসে। দেখে খুব খুশী হয় যে সোহানার গলা জড়িয়ে আছে সোহাগের মেয়ে শান্তি। সদ্য এস এস সি পাশ করেছে শান্তি। বাবা মার আড়ালে দাদীর সাথে দেখা করতে এসেছে। তিন জন মিলে অনেকেন গল্প করলো। সোহানা নিজের রুমে একা একা থাকেন, বোবার মতই দিন কাটে। অনেকদিন পর এখানেও সে কারো সাথে প্রান খুলে কথা বললো, হাসলো। আমেনা কিছু খাবার সঙ্গে করে এনেছিল, তিনজন মিলে মজা করে খাওয়া দাওয়া করলো। সোহানা ভাবলো কত ভালোই না হতো প্রত্যেকটা দিন যদি এমন হতো। স্বপ্নের মত একটা দিন কাটলো তার।

শান্তি বাবা মার সাথে যেসব কথা বলতে পারেনা সেগুলো নিশ্চিন্তে প্রাণ খুলে দাদীর সাথে বলতে পারে। আজ এসেছিল কলেজে ভর্তির বিষয়ে আলাপ করতে। সরকারী কলেজে ভর্তি হতে পারেনি বলে বাবা রাগ করেছে, মা বকা দিয়েছে। ভাইটা ছোট, তার সাথেও কোন কিছু তেমন করে শেয়ার করা যায়না। দাদীর কথা তাই মনে পড়ে এবং দেরী না করে তাই একমাত্র ভরসা দাদীর কাছেই ছুটে আসে। একটা বেসরকারী কলেজে ভর্তি হবে, দাদীকে সঙ্গে যেতে হবে আবদার করেছে শান্তি। সোহানারতো এখন আর তেমন কোন ব্যস্ততা নেই, সেজন্য রাজী হয়ে যায় যেতে।

পরদিন যথাসময়ে দাদী-নাতনি কলেজে যায়। অফিস রুমে গিয়ে সব কাজ সারতে প্রায় তিন ঘন্টা লেগে যায়। তাই বের হওয়ার আগে কলেজ-কেন্টিনে গিয়ে একটু খেয়ে নেয় দুজনে। তারপর কি মনে করে সোহানা শান্তিকে বলে, "তুই বস, আমি একটু প্রিন্সিপ্যালের সাথে দেখা করে আসি"। পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই রেগে যান প্রিন্সিপ্যাল ম্যাডাম। চেঁচিয়ে উঠেন, "কি চাই? কার পারমিশনে ভিতরে ঢুকেছেন?

থতমত খেয়ে যায় সোহানা। পরে সামলে নিয়ে নিজের পেশাগত পরিচয় দিতে প্রিন্সিপ্যাল ম্যাডাম তাঁকে বসতে বলেন। দুচার মিনিট কথার পরই দুজন দুজনকে চিনতে পারে।

খুব খারাপ পরিস্থিতিতে দুজনের পরিচয় হয়েছিল আজ থেকে বহু বছর আগে। একাত্তরে পাক সেনারা ধরে নিয়ে অন্য অনেক মেয়েদের সাথে ওদেরও একই ক্যাম্পে আটকে রেখেছিল। বেশ কয়েক মাস ওদের একসাথে কেটেছিল। কত

অন্তরঙ্গ গল্প করেছে তারা। আবার অত্যাচারের মাত্রা যখন অসহ্য হয়ে যেত তখন রাগে দুঃখে অপমানে ওরা অনেকেই অনেকবার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু মিলিটারীদের কড়া পাহারায় সেটাও পারেনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাক বাহিনী পালিয়ে গেলে ওরা সবাই ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু যাবে কোথায়? বাসায় ফিরে পরিবারের সবাইকে বিপদে ফেলা বা অপ্রস্তুত করাটা উচিত হবে না। তাই যে যার মত পথে নামে। কেউ ভিক্ষা করে, কেউবা মানুষের বাসায় কাজ করে খায়। কতজন যে মানষিক ভারসাম্য হারিয়ে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে যায় তার কোন হিসাব কেউ রাখেনি।

প্রিন্সিপ্যাল ম্যাডামের নাম জোহরা আফজাল। সোহানার মনে পড়ে যে এর নাম আগে ছিল জোবেদা। তিনি নামটা পাল্টে ফেলেছেন। নাম পাল্টালেও চিনতে পারে একে অপরকে, বুকে জড়িয়ে ধরে। কথাবার্তা চলে অনেকন। কত বৎসরের গল্প সেকি আর তাড়াতাড়ি শেষ হয়? এদিকে শান্তি একা একা কেন্টিনে বসে থেকে বিরক্ত হয়ে একসময় উঠে পড়ে। প্রিন্সিপ্যাল ম্যাডামের রুমের সামনে এসে অপেক্ষা করে কখন দাদী বের হবেন। কিন্তু না, দাদী বের হননা। এক সময় লুকিয়ে পর্দা একটু তুলে দেখে যে দুজনের চোখই অশ্রুশিক্ত। এর মধ্যে ঢোকাটা ঠিক হবেনা তাই আর ওখানে অপেক্ষা করে না। আবার কেন্টিনে গিয়েই বসে। আরও কতক্ষন যে বসতে হবে কে জানে!

সোহানা জানতে পারে যে জোবেদা নামটা ছিল জোহরার ছদ্মনাম। ওর আসল নাম ছিল জোহরা খানম। সেও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল তবে ভাগ্য ভাল ছিল বলে অনেক দেরীতে গর্ভবতী হয়েছিল এবং স্বাধীনতার পর স্বেচ্ছাসেবীদের ক্লিনিকে অন্য অনেকের মত নিরাপদে গর্ভপাত করাতে পেরেছিল। তারপর সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। তার যুক্তি হলো আহত হলে চিকিৎসা করে সুস্থ হওয়াটা খুব প্রয়োজন এবং এটা তার অধিকারও বটে। অন্যের কারনে সে তবিত হয়েছে বলে তাকে কেন শাস্তি ভোগ করতে হবে? দোষীকে যদি শাস্তি দেয়া যায় ভাল, যদি না দেয়া যায় সেটা অন্য কথা। তার দায়তো আর ও বয়ে বেড়াতে পারেনা। অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছে জোহরা। সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য ঘরে ফিরে গেছে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, চেনা-পরিচিতদের মধ্যে থেকে যখন প্রশ্ন উঠেছে ও কোথায় ছিল এতদিন, ও জবাব দিয়েছে যে সে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। অনেক ত্যাগ স্বীকার করে দেশ স্বাধীন করে ফিরে এসেছে। ও একজন মুক্তিযোদ্ধা। ফলে ওর সাথে সাথে ওর পরিবারেরও সম্মানও বহুগুণে বেড়ে যায়।

পড়াশোনা শেষ করে আফজাল নামের একজন বড় ব্যবসায়ীকে বিয়ে করে জোহরা আফজাল নাম গ্রহন করেন। ভাল একটা সরকারী চাকরী করেছেন এতদিন। এখন অবসর নেয়ার পর এই কলেজে প্রিন্সিপ্যালের পদটা পেয়েছেন। তিনি জানান যে সোহানা ইচ্ছা করলে এই কলেজে শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দিতে পারে, তবে বীরঙ্গনা

পরিচয়টা জানাতে হবে। কিন্তু না, সোহানা তা করতে রাজী নয়। প্রিন্সিপ্যাল বারবার বোঝান যে সেতো কোন দোষ করেনি, সে কেন পরিচয় দিতে লজ্জা পায়। না, যে পরিচয় এতদিন দিলে এতদিন হয়তো অনেক লাভবান হতে পারতো জানা সত্বেও সে লুকিয়ে রেখেছে, সেটা আজ আর নতুন করে বিক্রী করতে চায়না। বাবা মার নিষেধ আছে।

এক ঘন্টা পর শান্তি আবার যায় প্রিন্সিপ্যালের রুমের কাছে। না, এখনও দাদী বের হননি, তাঁদের গল্প বোধ হয় শেষ হয়নি। কিন্তু আর কতক্ষন অপেক্ষা করবে? এবার সে প্রিন্সিপ্যালের অনুমতি নিয়ে ভিতরে ঢুকে। সোহানাও আর দেরী করেনা। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে চলে আসে। আসতে আসতে ভাবে এই কলেজে শান্তিকে ভর্তি করা কি ঠিক হবে? যদি জোহরা কথায় কথায় শান্তিকে কোন কারনে ওর বিষয়ে সব কিছু বলে ফেলে কি হবে?

যে সত্য, সে কষ্ট এতদিন একা একা সহ্য করে বুকের মাঝে চেপে রেখেছে, সেটা বের হয়ে আসুক এটা তার কাম্য নয়। তাই সোহানা শান্তির ভর্তির ব্যাপারে আরও কয়েকটা কলেজে খোঁজ নেয়। দুয়েকটা কলেজে ব্যবস্থাও প্রায় হয়ে যায়। কিন্তু শান্তিকে বোঝাতে পারেনা কেন সে তার ঐ কলেজে ভর্তি হওয়াটা পছন্দ করছেনা। শান্তি বরং ভেবেছিল যে যেহেতু প্রিন্সিপ্যালের সাথে দাদী অন্তরঙ্গ আলাপ করছিলেন, তিনি বোধ হয় ওর ঐ কলেজে ভর্তি হওয়াটাই পছন্দ করবেন। কিন্তু উল্টোটা হওয়ার কি কারন থাকতে পারে। জিজ্ঞেসও করতে পারছেনা, বেয়াদবী হয়ে যেতে পারে। পরে দাদীর পছন্দের কলেজেই ও ভর্তি হয়। আগের কলেজে ভর্তি না করাতে প্রিন্সিপ্যাল জোহরা আফজাল মনে মনে একটু রেগেই ছিল সোহানার উপর।

শান্তির কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আমেনার স্বামী ডঃ ইসমাইল। আমেনা একদিন কোন কারনে স্বামীর কলেজে যায়, শান্তির সাথে ওখানে দেখা হয়। ওর কাছে সোহানার ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়। পরে আবার একদিন সোহানার হোষ্টেলে দেখা করতে যায় আমেনা। এবার সে তার স্বামীর সাথে সোহানার ব্যাপারে আলাপ করে এসেছে। ওদের কলেজে সোহানা ইচ্ছা করলেই যোগ দিতে পারে। কলেজে টিচার্স হোষ্টেলও আছে, সেখানে থাকতে পারবে। কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকলে শরীর মন দুইই ভাল থাকবে। আর একটা কথা বলবার অনুমতি চায় আমেনা। সোহানা বুঝতে পারেনা যে কি এমন বলবে যার জন্য অনুমতি লাগবে। যাহোক অনুমতি পেয়ে আমেনা জানায় যে শান্তিকে তার খুব পছন্দ। তার ছোট ছেলে মাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে। নিশ্চয় ভাল চাকরী পেয়ে যাবে। শান্তির সাথে ওর বয়সের পার্থক্য প্রায় ছয় সাত বৎসর হবে। সোহানা আর শান্তি যদি রাজী থাকে তাহলে ওদের বিয়ে দিতে পারে। সোহানা জানে যে এক্ষেত্রে তার মতামতের কোন দাম নাই। সেটাই সে জানায় আমেনাকে। আমেনা অবশ্য আন্দাজ করতে পারে এবং জানায় যে সোহানা যদি কলেজের চাকরীতে যোগ দেয়, যদি ছেলে বৌকে মাসে মাসে টাকা দেয় তাহলে আবার

সোহানাকে আর তার মতামতকে ওরা দাম দিতে শুরু করবে।

সোহানা নতুন কলেজে যোগ দিয়েছে প্রায় এক বৎসর হলো। সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ভীষন ব্যস্ত থাকে বলে এখন আর থ্যারাপী দেয়ার সময়ও হয়না, প্রয়োজনও হয়না। শান্তি ভালোমত পড়াশোনা করছে। সোহানা প্রয়োজনে শান্তির পড়াশোনায় সাহায্য করে। যথাসময়ে শান্তি এইচ এস সি পাশ করে, ভাল ফল করে। সোহানার নতুন চাকরী দুই বৎসরের বেশী হয়েছে। এবার আমেনা আবার ঐ বিয়ের প্রস্তাবটা নিয়ে ভাবতে বলে সোহানাকে। সোহানা আজকাল প্রায়ই, বিশেষ করে মাসের শুরুতে বেতন পেলে টাকা দিতে ছেলের বাসায় যায়। ছেলে বৌ দুজনেই খুব খাতির যত্ন করে। নতুন টাকার উৎস বলে কথা। নাতী-নাতনিরাতো খুশী হয়ই।

শান্তির পরীক্ষার ফল বের হওয়ার পর সোহানা মিষ্টি নিয়ে যায় ঐ বাসায়। তখন সে তাদের কাছে প্রস্তাবটা রাখে। ছেলে সোহাগ একটু অবাক হয় যে মা নিজে এত শিক্ষিত একজন মহিলা, এই অল্প বয়সে কেন মেয়েটার বিয়ের প্রসঙ্গ তুলতে পারেন তিনি। তাছাড়া বয়সও ছেলেটার একটু বেশী। তবে প্রতিষ্ঠিত ছেলে হলে বয়সতো হবেই। অবশ্য বৌ খুশী হয়, কারণ দাদীটা বেঁচে থাকতে থাকতে বিয়েটা হয়ে গেলে রোজগেরে দাদী নিজেই সব খরচ বহন করবে। যাহোক তাড়াহুড়ার কিছু নাই। মেয়ে পড়ছে পড়ুক। তাছাড়া শিক্ষিত পাত্র, শিক্ষিত পরিবার, বিয়ের পরও পড়াশোনা করতে পারবে সে নিশ্চয়তা আছে ও বাড়ী থেকে।

বিয়ের কথা দুই এক পা করে এগিয়ে চলে। এদিকে শান্তি অনার্সে ভর্তি হয়, পড়াশোনা করে। শান্তি বলেছে বিয়েতে সে যেকোন সময়ে চোখ বন্ধ করে রাজী হতে পারে যদি বিয়েতে দাদী খুশী থাকেন। একথা জানার পর সোহানার দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। সতর্কতার সাথে আরও বেশী খোঁজ খবর নিয়ে সবার সাথে বেশ কয়েকবার বৈঠক আলোচনা করে বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেলে। শান্তির ভাই এস,এস,সি পরীক্ষার্থী। ওর পরীক্ষার পরপরই বিয়ের দিন ধার্য হয়।

আজ শান্তির বিয়ে। প্রচুর ধুমধাম করে বিয়ে হচ্ছে। শহরের অনেক বড় বড় লোকজন এসেছেন। প্রিন্সিপ্যাল জোহরা আফজালও এসেছেন। সোহানা একটু ভয় পায়, কি জানি ও যদি কোন সমস্যা করে, যদি কিছু বলে ফেলে। না, তিনি আপত্তিকর কিছু বলেননি। শুধু ঠাট্টা করে বললেন, "আমার কলেজ থেকে ইসমাইল ভাইয়ের কলেজটাও তোমার পছন্দ হলো বেশী, আর তাঁর ছেলেকেও"?

সোহানা বলে, "ভাগ্যই শান্তিকে ঐ কলেজে নিয়ে গিয়েছে, আমি আর কি করবো?"

যাহোক নির্বিঘ্নে ওদের বিয়ে পড়ানো, রেজিষ্ট্রীর কাজ সম্পন্ন হয়। অতিথি আপ্যায়ন চলছে। অতিথিদের সবাইকে চিনেনা সোহানা। তবু যতদুর সম্ভব সবার সাথে আলাপ করতে হয়। আমেনাদের পরে মেহমান আছে, শান্তির নানাবাড়ীর মেহমান আছে। তবে কিছু বয়স্ক লোকজনকে দেখতে পায় সোহানা যাদের তার কাছে মনে হয় যেন

অনেকদিন আগে কোথাও দেখেছে। মনে করতে পারেনা। একসময়ে তাদেরই একজন এগিয়ে এসে আলাপ করে। আলাপ করতে করতে বলে ফেলে, "তুমি আমাদের পাড়ার সেই সোহানা না? তোমাকে তো পাক আর্মীরা ধরে নিয়ে গেছিল। তারপর থেকে আর তোমার কোন খবর জানিনা আমরা। তোমার বাবামা তোমাকে খুঁজে খুঁজে পাগল হয়ে গেছিলেন। পরে কবে কোথায় খুঁজে পেলেন তোমাকে? তারপর কোথায় পালিয়ে গেলে তোমরা? তোমার কি বিয়ে হয়েছিল, নাকি এই মেয়ের বাবা তাদেরই সন্তান?"

আরো হয়তো অনেক কথা তারা বলেছিল সোহানার কানে সেগুলো ঢোকেনি। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। পিছনে পড়ে থাকে বিয়ে বাড়ী, সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে সোহানাকে নিয়ে। হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। কয়েক ঘন্টা পরে জ্ঞান ফিরে এলে নিজেকে খুব অপরাধী পাপী মনে হয়। ভাবে কেন সে ক্যাম্প থেকে ছাড়া পাওয়ার সাথে সাথে আত্মহত্যা করলো না। তাহলে আর আজকে তার জন্য সবাইকে এমন বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হতোনা। বেচারা শান্তির তো কোন দোষ নেই। সব জেনে ফেললে আমেনাতো আর ওকে পুত্রবধু হিসেবে ঘরে তুলবেনা। শান্তির মা নিজের শাশুড়িকে কি এমনি এমনি ছেড়ে দিবে? কারা ছিল ওরা, ওরা কি শান্তির নানা বাড়ীর লোক?

কি হতে চলেছে কিছুই জানেনা। এখনই বা সে কেন বেঁচে গেলো? মরে গেলেতো আর তাকে অন্তত পরের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতোনা। চোখ বন্ধ করে এগুলো ভাবছে আর চোখ দিয়ে শ্রাবনের ধারা অবিরাম ঝরে চলেছে। মরে যেতে ইচ্ছা করছে ভীষন। কেন সে বেঁচে উঠলো? কিভাবে সে সবাইকে মুখ দেখাবে? নিজের পেটের ছেলেইতো বলবে, "তুমি কেন আমাকে জন্ম দিলে? কেন নিজে মরে আমাকে এই নোংরা পরিচয়ের হাত থেকে বাঁচালে না। আমার বাবার নাম তাহলে কার নামে রেখেছো?" কি বিব্রতকর অবস্থা!

একটা ঠান্ডা হাত তার কপাল স্পর্শ করে। চোখ খোলেনা সে। খুললেই কি দেখতে হবে কে জানে। এবার কেউ বোধ হয় তার কপালে চুমু খায়। নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছে। এখনতো ওর জন্য যত তিরষ্কার তোলা আছে। কে এমন মহান ব্যক্তি আছে যে সবকিছু জানার পর তার কপালে চুমু খাবে। তার বদলে পারলে পয়সা পুড়িয়ে কপালে ছ্যাঁকা দিবে কষ্ট দেয়া ছাড়াও অপমান করার জন্য। এবার কেউ এসে তার হাত ধরে। কি হচ্ছেটা কি, ওকি তাহলে মরেই গেছে, সবাই এভাবে ওর জন্য শোক করছে শেষ বিদায় জানানোর আগে?

"কেমন লাগছে এখন?" এবার চোখ খোলে। তাকিয়ে দেখে আমেনার বড় ছেলে, শান্তির ভাশুর। আগেও দেখা হয়েছে। ছেলেটা ডাক্তার। কি বলবে ভেবে পায়না, তাই জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে। ডাক্তার আবার বলে, "সবাইকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন আন্টি"। বলেই হেসে উঠে। বলে, "আন্টি বলবো না দাদী বলবো?

আপনি তো আবার আমার ভাইয়ের দাদী শ্বাশুড়ী"। মনে আশা জাগে, তাহলে কি ওরা শান্তিকে মেনে নেবে? কপালে যে চুমু খাচ্ছিল, সে এবার সামনে আসে। সে আর কেউ নয়, তার আদরের ছেলে সোহাগ। এবার সত্যিই তার কাছে সব কিছু স্বপ্ন মনে হয়।

সোহাগ মায়ের হাত ধরে বলে, "এখন কেমন আছো মা? আমরা সবাই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কেনো তুমি একা একা এত বৎসর সব কষ্ট বুকের মধ্যে জমিয়ে রেখে সহ্য করেছিলে। জানোয়াররা যা করেছে তার জন্য তাদের লজ্জা হওয়ার কথা, তোমার নয়। তুমি বরং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বেচ্ছায় হোক বা নাহোক সক্রিয়ভাবে জড়িত। এটা তোমার বা আমাদের কারও অসম্মান নয়। তোমার জন্য আমরা সবাই গর্বিত। ওদিকে তাকিয়ে দেখো মা।"

তাকিয়ে দেখে শান্তি আর ওর বর আশিক ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওকে দিবে বলে। দুই পাশে শান্তির শ্বশুর-শাশুড়ী। সবার খুব হাসিখুশী মুখ। পিছনে দাঁড়িয়ে আছে শান্তির মা। তার মুখটা অবশ্য অন্যদের মত উজ্জ্বল নয়। ওর মুখতো কালই হওয়ার কথা। ওতো রাজাকারের মেয়ে। সোহানার জয় মানেতো ওর পরাজয়। শান্তি আর আশিক এগিয়ে আসে। বলে, "দাদী, আপনি আমাদের জীবন্ত স্মৃতিসৌধ। তাই আপনাকে আমরা ফুল দিয়ে সম্মান জানাবো"। এগুলো সব সোহানার কল্পনারও অতীত।

সবাই সোহানাকে খুব আদর যত্ন করে বাসায় নিয়ে যায়। বাসায় গিয়ে আমেনা ওকে জড়িয়ে ধরে। বলে আমাদের দুজনের এতদিন এত গল্প হলো, আমাকে তো দুঃখের কথা বলে একটু হালকা হতে পারতে"। সোহানা বলে, "আমি কিভাবে জানবো যে তোমরা এত ভাল, এত মহৎ? আচ্ছা তুমি কি জানো ওরা কারা ছিল? কাদের মেহমান ওরা। আর কি কি বলেছিল ওরা?"

অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পরে কি কি ঘটেছিল বিস্তারিত জানায় আমেনা। ঐ লোকগুলো তখনও জঘন্য ভাষায় কথা বলে যাচ্ছিল সোহানার ব্যাপারে যেন স্বাধীনতার শত্রুদের জঘন্য অপরাধের জন্য সোহানাই দায়ী। সোহাগ আর ডঃ ইসমাইল তাদের শান্ত করার চেষ্টা করে, আর আমেনার বড় ছেলে ডাক্তার আশরাফ ফোন করে নিজের হাসপাতাল থেকে এ্যাম্বুলেন্স আনিয়ে ওকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে দ্রুত ভর্তি করে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তোলে। আমেনা জানায় যে ওই লোকগুলো তাদের অজান্তেই অনেক উপকার করে গেছে। একজন বীরমাতার পরিবারের সাথে আত্মীয়তা করতে পেরে তারা খুশী ও গর্বিত।

সোহানা ভাবে আমেনা সেদিন বলছিল ও বেশী লেখাপড়া করেনি। কে বলেছে ও লেখাপড়া করেনি? ওতো প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে। কত উদার ওর মনটা। পুরো পরিবারটাই কত উদার! কেউ একজন বাধ সাধলেই তো ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে যেতে পারতো। আল্লাহকে অনেক ধন্যবাদ যে এই সম্মানটা পাওয়া পর্যন্ত তাকে

বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এবং এমন একটা মহান পরিবারের সাথে তিনি যোগাযোগ ঘটিয়েছেন। সবার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মনটা ভরে যায় আর চোখদুটো প্লাবিত হতে থাকে।

জোহরা আফজাল এবার সোহানাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। মুখেমুখে একটা প্যারোডীগান তৈরী করে গাওয়া শুরু করে,

"জয় বাংলা, বাংলার জয়, এখন শুধুই হাসিখুশী, কোন দুঃখ নয়"।

সাথে আমেনা যোগ দেয়,

"এখন আমরা সবাই করবো আনন্দ, কান্নাকাটি সব একদম বন্ধ।"

সবাই একসাথে আনন্দ করলেও কারও চোখ শুকনো থাকে না। সবার চোখেই আনন্দাশ্রু।

লেখক পরিচিতি
সাবেক রাষ্ট্রদূত

নারী স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা

প্রফেসর ড. দিলারা হাফিজ

১. মহান স্বাধীনতা মাসের এই শুভ মুহূর্তে আমি স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জাতীয় চার নেতাকে। ত্রিশ লক্ষ শহীদ দু'লক্ষ মা-বোন-যাঁদের সম্মলিত আত্মত্যাগের বিনিময়ে পেয়েছি লাল-সবুজ পতাকা উড্ডীন এই স্বদেশ। জাতির এই সূর্যসন্তানদের আত্মার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

এ কথা বলা বাহুল্য যে, শত শত বছরের অক্লান্ত সাহসী আত্মত্যাগী স্বাপ্নিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী চিন্তক নর-নারীর সুদূর প্রসারী ভাবনার ফলেই আমরা আজ নারী-পুরুষের মিলিত এক সমন্বিত উন্নত বিশ্বের স্বপ্ন দেখি, যে বিশ্বে নারী নিজের লিঙ্গের ওপর আস্থা রাখেন এবং গর্ববোধ করেন। আপন লিঙ্গীয় পরিচয় নিয়েই পুরুষের সঙ্গে জীবনের ক্ষেত্রে সমঅধিকারের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনায় তারা বিশ্বাসী। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেন-

এ বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।

রবীন্দ্রনাথ এক প্রবন্ধে বলেছেন, নারী পুরুষের মিলনেই জীবন ও জগত সুন্দর, অর্থময়। সভ্যতার বিনির্মাণে নারীর অবদানের এই স্বীকৃতি কাব্যে, কথনে ও সাহিত্যের পাতায় যতোটা শোভাময়, বাস্তব জীবনে ততোটাই তা উপেক্ষিত থাকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই উপেক্ষার ফলেই আজকের দিনেও একজন নারী যখন কবিতা লেখেন, বিষয়বস্তু হিসেবে নারীর অতীত বন্চনা, শোষণ, সামাজিক নিপীড়ন, ক্ষোভ, অভিক্ষেপ সমূহ উঠে আসে অবলীলায়।

'নারী' নামক কবিতায়-

বহু ঝড় জলোচ্ছ্বাস আর অগ্ন মাড়িয়ে
আজ আমি এখানে এসে দাঁড়িয়েছি একা-
সম্পূর্ণ একলা
নৈঃসঙ্গ ছাড়া কোনো বন্ধু ছিলো না আমার:
করতলে হাত রেখে
গোপন কোনো বেদনা জানাতে পারি অকপটে
এ রকম কোনো বন্ধু কখনো ছিলো না।
অতিক্রান্ত এই দীর্ঘ যাত্রায়
কিছু শব্দ, বাক্য আর ছন্দের মিলমিশে

এক মেঘাবৃত্ত আকাশ ছায়া দিয়েছে মাথায়
ঝড় বিদ্যুৎ তুষারপাত অগ্ন্যুৎপাত
আমার নিত্য সঙ্গী
আমি এক অখ্যাত কন্যা সন্তান
আমার শারীরীক মূল্য দত্তা ও তামার
দরের চেয়ে বেশি নয়,
আমি ভুলে যাইনি
আইয়ামে জাহেলিয়াত যুগে জন্মমাত্রই
আমাকে হত্যা করা হতো গলা টিপে,
আমার জন্যে গর্বিত হয় না কখনো
আমার পিতৃকূলের কেউ;
আমার ভাই সোনার দরে বিকোয় আজো
এই পড়ন্ত যৌবনেও
অলংকার গড়াবার মতো খাঁটি সোনা সে
বংশ রক্ষার প্রধান কবচ
আমি কেউ নই, কোথাও থাকি না আমি
কোথাও স্থিতি নেই আমার
বহু ঝড় জলোচ্ছ্বাস আর অগ্নি মাড়িয়ে
আজ আমি এখানে এসে দাঁড়িয়েছি একা;
আমি জানি আমাকে ছাড়া
পৃথিবী এগোবে না একটি পা-

নারী পুরুষ আমরা উভয়ই এ কথা অস্বীকার করতে পারবো না যে, নারীকে ছাড়া সৃষ্টি ব্যর্থ। আরো জানি কেউ এককভাবে এই সভ্যতাকে আমরা সমুখপানে এগিয়ে নিতেও পারবো না। এজন্যে সম্ভবত ১৯৯৫ সালে বেইজিং অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনে নারী নেত্রী গারটুড ম্যান্ডেলা বলেছিলেন, "আসুন, বিশ্ববাসীকে আমরা গর্বের সঙ্গে বলি যে, নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে গোটা মানব জাতির ক্ষমতায়ন"। আমরা জানি, নারী যখন এগিয়ে যায়, তখন পরিবার, সমাজ এবং দেশও এগিয়ে যায়। নারীর অগ্রগতিকে শুথ করে দেয়, বাধা দেয় এমন যা কিছু- তা শুধু নারীকে নয়, দেশের অগ্রগতিকেও বাধাগ্রস্ত করে। ঐ সম্মেলনেই নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা তথা সারা বিশ্বের মানবধিকার নেত্রী উইনী ম্যান্ডেলা বলেছিলেন, নারীর স্বাধীনতা যতোদিন অর্জিত না হবে ততোদিন নারীর উপর নির্যাতন বন্ধ হবে না"।

এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করি নারী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা মেরী ওলাস্টোন ক্রাফট সেই আপ্তবাক্য "যতোদিন না নারীকে আপন চেতনালব্ধ যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে দেয়া হয়, যতো দিন না নারীর বিচার ক্ষমতা গড়ে ওঠে, ততোদিন মানব সমাজের প্রতিবন্ধকতা রয়ে যাবে"। এ কথা মানতেই হবে তাঁর এই উক্তির মাধ্যমেই নারী

সমাজের মুক্তির কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

কিন্তু নারী মুক্তির অর্থ কী? কীভাবে নারী তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে? নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন কী শেষ কথা? বৈশ্বিক পটভূমি ছেড়ে নিজেদের দিকে তাকালে দেখতে পাই, বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে একটি দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন দেশ হিসেবে নিজের অবস্থান দৃঢ় করার প্রত্যয় ঘোষণা করেছে। এদেশের নারীরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠছেন, সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছেন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দেশের অর্থনীতিকে মজবুত রাখছেন, শস্য ভান্ডার পূর্ণ করছেন, সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনায় আগ্রহ এবং সক্ষমতার স্বাক্ষর রাখছেন। দুর্যোগ মোকাবেলা করছেন। নারী নিজে স্বপ্ন দেখছেন, নারী স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। নারীর এই পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটছে রাষ্ট্রীয় আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আজ যে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচকে এগিয়ে চলেছে, তা সম্ভব হচ্ছে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সমাজ জীবনে ব্যাপক হারে নারীর সম্পৃক্ততার কারণে।

তবে মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশে এ দৃশ্যের উল্টো পিঠে আছে নারীর অসহায়ত্বের, বঞ্চনার, বৈষম্যের আর নির্যাতনের ছবি। চলমান সময়ে বাংলাদেশে নারী নির্যাতন সমস্ত অর্জনকে ম্লান করে দিচ্ছে। নারীর অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা আর উন্নয়নের অপার সম্ভাবনার বিপরীতে কাজ করছে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ। আর চ্যালেঞ্জ সমূহই হচ্ছে টেকসই উন্নয়নের পথে পাহাড় প্রমান প্রতিবন্ধকতা।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) মাত্রা অর্জনের পরে ২০১৫ পরবর্তী নতুন উন্নয়ন ভাবনা যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (sustainable Development Goal—SDG) নামে পরিচিত। ২০১৫ সালের ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর তিন দিনের এই সম্মেলন জাতিসংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানগণ এতে অংশ গ্রহন করেছিলেন। টেকসই উন্নয়নের কর্মসূচির এ উদ্যোগ সারা বিশ্বের উন্নয়ন টেকসই করতে ১৭টি লক্ষ্য ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে ৫ নম্বর লক্ষ্যটি হচ্ছে জেন্ডার সমতা।

এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে জেন্ডার সমতা অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের নারীনীতি, বর্তমান কার্যক্রম, অবস্থা ও অর্জন সম্পর্কে আমরা একটু দৃষ্টিপাত করতে পারি।

লক্ষ্যমাত্রা ৫.১: সকল ক্ষেত্রে সব নারী ও মেয়েদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ।

নীতি:

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯ (সিডও) এর বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা।

বর্তমান কার্যক্রম অবস্থা ও অর্জন

সিডও সনদের আলোকে সরকারি বেসরকারি প্রতিবেদন জাতিসংঘের সিডও কমিটিতে উপস্থাপন করা।

লক্ষ্যমাত্রা ৫.২: পাচার, যৌন নির্যাতন এবং সকল ধরনের নির্যাতনসহ জনজীবন এবং ব্যক্তিজীবনের সব নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা রোধ।

নীতি: কন্যাশিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচারের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা।

বর্তমান কার্যক্রম অবস্থা ও অর্জন:

ক) ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার,
খ) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্প লাইন সেন্টার,
গ) ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরি,
ঘ) নারী পাচার নিরোধ সেল'ওমেন সাপোর্ট সেন্টার।

নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপনের জন্যে জেন্ডার সমতায় আরো বেশ কিছু লক্ষ্যমাত্রা গ্রন্থিত আছে। এর কার্যক্রমেও তা সক্রিয়। তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রথমবারের মতো একটি জরিপ পরিচালনা করেছে যা সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। উদ্বেগের বিষয় হলো নতুন নতুন আইন প্রনয়ন করা সত্ত্বেও নির্যাতনের ঘটনা ও ধরন বেড়েই চলেছে। আইনের প্রয়োগও এক্ষেত্রে দুর্বল। ক্ষেত্র বিশেষে তা জটিল, ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘ আইনী প্রক্রিয়াগুলো নারীর ন্যায় বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ।

২০১২ সালে প্রণীত পাচার দমন আইন বাস্তবায়নের জন্যে বিধিমালা ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল না থাকায় পাচার ও যৌন শোষণের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচ্ছে।

যদিও ক্ষমতার কাঠামোতে নারীর অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আছে। স্পিকার হিসেবে একজন নারীকে নির্বাচন, মন্ত্রীপরিষদে নারীর অন্তর্ভুক্তি, বিভিন্ন সংসদীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীর অবস্থান আন্তর্জাতিক মহলে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রশংসিত হয়েছে, কিন্তু আমরা জানি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এসব পদক্ষেপ গ্রহণ না করে ব্যক্তি ইচ্ছা বা দলীয় সমর্থনে এই ধরনের গৃহীত পদক্ষেপ স্থায়ী হবে না।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নারী আন্দোলনের ফলে স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত নারী আসনে বিপুল সংখ্যক তৃণমূলের নারী সরাসরি নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। এখনো পর্যন্ত একদিকে তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নানাবিধ চ্যালেনেজর সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বৈষম্য ও বন্চনার শিকার হতে

হচ্ছে। অপর দিকে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনেও তাদের সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। এক্ষেত্রে প্রশাসন এবং প্রশাসনিক কাঠোমোকে আরো শক্তিশালী, জেন্ডার সংবেদনশীল ও কার্যকর সহায়ক হতে হবে।

বাজেটে নারীর জন্যে যে বরাদ্দ রাখা হয়, শেষ পর্যন্ত তা ব্যয় হয় কিনা , হলেও নারীর উন্নয়নে তা কতটুকু প্রভাব ফেলে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমরা জানি, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরেও নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিলো। তা থেকে ৩৪ কোটি টাকার বেশি ছাড় করা হয়নি।

বাজেট বরাদ্দের ঘোষণা দেয়ার পাশাপাশি তার ব্যবহার নিশ্চিত করাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা আশা করবো, নারীর জন্যে বাজেটে যে বরাদ্দ দেয়া হয় তা যেন যথাযথভাবে কাজে লাগানো হয় এবং সেটি দেখার জন্যে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ প্রক্রিয়া ঠিকমতো কাজ করছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যসূচি ও টেক্সটবই পর্যালোচনা করে জেন্ডার সংবেদনশীল করার জন্যে কোনো সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি।

আইনি বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে এখনো নিম্নমানের কর্মপরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে "কর্মক্ষেত্রে নারী ও কিছু ভাবনা" শীর্ষক শায়লা রহমানের প্রবন্ধের একটি উক্তির উল্লেখ না করে পারছি না। লেখক শায়লা তখন প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, আর উক্তিটি ছিলো একজন মেজর কর্মকর্তার, যিনি কঙ্গোতে এক মিশনে যাবার প্রাক্কালে তার টিমের পক্ষ থেকে অগ্রিম বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা নিতে এসেছিলেন। দুজনেই সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তবে দু'জনেই নারী কর্মকর্তা। তাঁর আভিক্ষেপময় উক্তিটি ছিলো এরকম, "আমরা না ভালো মা হতে পারি, না ভালো স্ত্রী, না ভালো পুত্রবধূ , না ভালো কলিগ হতে পারি"।

একজন নারী কর্মকর্তা পুরুষের পাশাপাশি যখন তার সমকক্ষতা দাবী করতে চাইবে অবশ্যই তাঁর দায়িত্ব কর্তব্যের চেতনাবোধ তার সমকক্ষ হতে হবে।

জানি, এই পৃথিবী, সমাজ, পরিবার আমাকে সর্বংসহা ধরনীর সঙ্গে তুলনা করেছে সন্তানের মা-জননী হিসেবে। জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমি আমার গর্ভে ধারণ করবো, পরিবার, সমাজ এবং দেশের জন্যে তাকে গড়ে তুলবো দেশপ্রেমিক একজন সুনাগরিক হিসেবে। স্ত্রী হিসেবে শান্তিদায়িনী, স্বামীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির জন্যে আমাকেই সতত অনুপ্রেরণার আধার হতে হবে। শ্বশুর শাশুড়ীমায়ের পুত্রবধূ হিসেবে দায়িত্ব-কর্তব্য যতোটা না তার পুত্রের, তার চেয়ে বেশি নারীর।এতোসব দায়িত্বের পরে আমি অফিসে আমার পুরুষ সহকর্মীর সমান দক্ষতা অর্জন করবো কীভাবে?

চারহাজার বছর আগে রচিত মহাভারতে দুর্গার মতো দশ বাহুযুক্ত এক নারী চরিত্র সৃষ্টির মধ্যেই এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত।

সম্ভবত, একারণেই শত সহস্র কাজে ব্যাপৃত নারীকে দেখতে পাই আমরা দশ বাহু বিশিষ্ট "দশভূজা দুর্গা" রূপে। কর্মজীবনের নারীকে তাই তুলনা করা হয় দুর্গার সঙ্গে। শ্লোকে বলা হয়, যে রাঁধে সেও চুল বাঁধে। আর যে নারী এতোসব কাজ করতে না পেরে ব্যর্থ হয়, তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় "নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা" -যেহেতু দীর্ঘকাল লেখা-পড়া, হিসেব-নিকেশ, অর্থ উপার্জন সব পুরুষের অধিকারে এতোকাল স্থায়ী হয়েছিলো। নারীর কাজের বন্টন তাই পুরুষ তার সুবিধে মতো করে নিয়ে ছিলো। বর্তমান সময়ের নারী যেহেতু তার বুদ্ধি-প্রজ্ঞা, মেধা-মননের প্রকাশ ঘটিয়ে প্রমান করেছেন, সুযোগ পেলে পুরুষের মতো যেকোনো কাজেই সে পারঙ্গম। কাজের বন্টন না হয় এখন নতুন করেই হোক। এ ক্ষেত্রে নারী কর্মকর্তা মা হিসেবে একাই কেন সন্তান- সংসার নিয়ে ভাববেন? স্বামীও শেয়ার করবেন তার পাশাপাশি।

আমি নিজে একজন কর্মজীবী নারী হিসেবে বলতে চাই, নারীকে সর্বত্র প্রতিরোধের, প্রতিবন্ধকতার এতোসব সাঁকো পেরিয়ে তার কর্মস্থলের ভারী দরোজা ঠেলে ভেতরে পৌঁছতে হয় যে, সেখানে তার জন্যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় উপকরণ থাকা আবশ্যক। যেমন একজন পুরুষ কর্মকর্তাকে অফিসে যে ধরণের পরিবেশ দেয়া হয়ে থাকে, একজন নারী কর্মকর্তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কর্মপরিবেশ দেয়া জরুরী। যেমন একজন নারী কর্মকর্তার অফিস সংলগ্ন হতে হবে তার সন্তানের স্কুল, শূণ্য থেকে পাঁচ বছর বয়েসী সন্তানের জন্যে অফিসের গন্ডির মধ্যেই থাকতে হবে ডে-কেয়ার সেন্টার ও চিকিৎসা সেবাকেন্দ্র। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট বা ডিফেন্স সার্ভিসের মতো ক্ষেত্র বিশেষে নারী কর্মকর্তাকে গাড়ির সুবিধা বা গৃহপরিচারিকার সুবিধা দিলে তাঁর পরিবার ও অফিস উভয় কর্মযজ্ঞের মধ্যে তিনি সমন্বয় ঘটাতে পারবেন। ফলে একদিকে দেশ পাবে সর্বোত্তম সেবা, অপর দিকে পরিবারেরও তিনি সুশিক্ষিত সুনাগরিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার ব্যাপারে অবদান রাখতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

সমগ্র মানব জাতির দুটি শাখা পুরুষ এবং নারী। আদম এবং হাওয়া। এই দু'জন মানুষের যৌথ খামারে সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র মানব জাতি। আদিম যুগের নারী সম্পর্কে সংস্কৃত ভাষার শ্লোকে বলা হয়েছে, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা"। পুত্র সন্তান সৃষ্টি করতেই ভার্যা বা স্ত্রীর প্রয়োজন। অন্যথায় নয়।অর্থাৎ শয্যাসঙ্গিনীর বাইরে নারীর আর কোনো বিশেষ ভূমিকার স্বীকৃতি ছিলো না সেই সমাজে। দীর্ঘ পথপরিক্রমা শেষে সেই নারী আজ রাজসিংহাসনে বসে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে অনেক পুরুষ রাষ্ট্র নায়কের চেয়ে অধিক দক্ষতায়, প্রশংসায় এবং আপন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির অভিজ্ঞানের বুদ্ধিদীপ্ত কর্মকুশলতায়। জয়তু নারী। তারপরেও কথা থেকে যায় নারীর বেদনা ও বিষাদে:-

কিছু স্বপ্ন, সুখ স্মৃতি আছে বলে আজোও
বেদনার ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে যাই সুখের কাহিনী।

(রফিক আজাদ, ব্যক্তিগত একটি ব্যর্থতা)

২. আমাদের সামাজিক জীবনে খ্রিষ্টিয় তিনটি মাস নিজ নামে যতো না পরিচিত, বাঙালির ঐতিহাসিক অর্জন ও মহান বিজয়ের নামেই পরিচিত অধিক।

ভাষার মাস- ফেব্রুয়ারি
স্বাধীনতার মাস- মার্চ
বিজয়ের মাস- ডিসেম্বর

- এই সময় পর্বে বাঙালি জাতি হিসেবে আমরা খুব বেশি মাত্রায় আবেগায়িত থাকি। যা অন্যান্য জাতিসত্তার ক্ষেত্রে এতোটা প্রবল নয় বলে মনে করি। যতো আন্দোলন, বাদ-প্রতিবাদ-সংগ্রাম-মুখর রাত্রি-দিন পার করে একটা সোনালি গন্তব্যে আমরা পৌঁছুতে পেরেছি- সবই এই সময়কালের ফসল। উপরন্তু ৮ মার্চ নারী দিবসটিও এই স্বাধীনতার মাসে জায়গা করে নিয়েছে স্থায়ীভাবে।

ইতোমধ্যে স্বাধীনতার উনচল্লিশ বছর পার করছি আমরা।

বিগত দশ বছরে দেশ এগিয়েছে অনেক। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনালোকে অঙ্গীকারাবদ্ধ সরকার ক্ষমতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। আমরা MDG গোল্স পূরণ করে ২০১৫ সাল পরবর্তী নতুন উন্নয়ন ভাবনা SDG (sustainable Development goal) অর্থাৎ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রার মহাসড়কে হাঁটছি প্রথম বিশ্বের সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়ে। জাতিসংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত (২৫ থেকে ২৭ সেপ্টম্বর-২০১৫) সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানের অংশ গ্রহনে টেকসই উন্নয়নের কর্মসূচির এই উদ্যোগ সারা বিশ্বের উন্নয়ন টেকসই করতে ১৭টি লক্ষ এবং ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এর মধ্যে ৫ নম্বরে রয়েছে জেণ্ডার সমতা। জেণ্ডার ইস্যুতে আমরা নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে যদিও অনেক পেছনে আছি তবু হাল ছাড়বো কেন???

নারী পুরুষের বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষে প্রয়োজনীয় গল্প কবিতা যদি শিশু শ্রেণীর পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা যায়- তাহলে দ্রুত এর সুফল পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করি। তাছাড়া নারী পুরুষের সমতা অর্জনে বিশ্ব আজ অনেকটা পথ এগিয়েছে বলে যদি ধরেও নিই তাহলেও শতভাগ বৈষম্যহীন দেশ হিসেবে মাত্র ছয়টি দেশের নাম উল্লেখ করা যায়:- বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, লাটভিয়া, লুক্সেমবুর্গ ও সুইডেন।

এক্ষেত্রে হতাশ হবার মতো খবর হলো বাংলাদেশের অবস্থান-১৬৯ তম। পার্শ্ববর্তী ভারতের অবস্থান ১২৫ তম এবং সৌদি আরবের অবস্থান ১৮৭ তম।

তবে আশার কথা হলো মা হিসেবে সন্তানের জন্মদান লালন পালনের সিংহভাগ দায়িত্ব নারী নিজে পরম মমতা ও ভালোবাসায় যে পালন করে থাকেন, এতোদিন তারই কোনো স্বীকৃতি ছিলো না। এমন কি, পিতার পাশাপাশি মায়ের নামটি জন্ম নিবন্ধন, সনদপত্র অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি কার্যক্রমের কোনো আবেদনপত্রে উল্লেখের প্রয়োজনই ছিলো না, সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে পিতার পাশাপাশি মায়ের নামটি লেখার জন্য যে আইন পাশ করেছেন এতেই জেন্ডার বৈষম্যের প্রথম এবং প্রধান ধাপ আমরা অতিক্রম করেছি বলে বিশ্বাস করি। আমাদের দেশের মেয়েরা হিমালয় স্পর্শ করছে- একি কম কথা!!

ইসলামের দৃষ্টিতে যেখানে নারী হলো শুধুই পুরুষের সম্পত্তিমাত্র। সেই অন্ধকার সমাজে, যেখানে কন্যা সন্তানের জন্মের খবর পেলে গলা টিপে তাকে হত্যা করা হতো- সেখান থেকে এই উত্তরণ অনেকটাই আলোকিত করেছে নারীকে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে আমার অঙ্কের শিক্ষক সংখ্যা ও শূন্যের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন যে, নারী হলো শূন্য আর পুরুষ হলো সংখ্যা।

: কিভাবে মেয়েরা শূন্য স্যার?

প্রশ্ন করতেই তিনি বলেছিলেন, নারী শূন্য এই জন্যে যে, নারীর নিজের তো কোনো বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান-গম্মি, লেখা পড়া নেই, কাজেই বড় একটা সংখ্যার পাশে বসলেই কেবল তার মূল্য বেড়ে যায়।

বুঝ, যেমন, ধরো, ১ একটা সংখ্যা এর ডানপাশে শূন্য বসলে হয় দশ, আর ৯ একটা সংখ্যা, ৯ এর পাশে বসলে হয় ৯০। বুঝলে তো মেয়েদের আলাদা কোনো মূল্য নেই। শূন্যের অবস্থাও এই রকম মেয়েদের মতো, তার আলাদা কোনো মূল্য নেই, কেবল মাত্র বিবাহে যোগে উপর্যুক্ত সংখ্যার পাশে বসতে পারলেই তার মূল্যের হেরফের হয়।

শুনেছি, মানুষের আত্মা অমর। আমার সেই স্যারের অমর আত্মার উদ্দেশে বলতে চাই যে, এবছর নারী দিবসে বাংলাদেশের যে পাঁচজন নারীকে সম্মাননা দেয়া হয়েছে, আমার বিবেচনায় তারা সকলেই শূন্য থেকে সংখ্যায় উত্তীর্ণ হয়েছে স্যার। কেননা, তাদের স্বামীর পরিচয় কেউ জানতেও চায় না। স্বনামেই তাদের পরিচয় উৎকীর্ণ রয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্রের আমলনামায়। তবু আজ উল্লেখ করছি তাদের নাম-পরিচয়, যথাক্রমে-

১) পরিবেশ মন্ত্রী সাজেদা চৌধুরী এমপি
২) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ্যাড সাহারা খাতুন "
৩) পররাষ্ট্র ও শিক্ষামন্ত্রী দীপুমনি "
৪) স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুর "
৫) মেজর জেনারেল সুশানা গীতি "

স্যার আপনার শূন্যের ধারণা পাল্টে দিয়ে এযুগের এই নারীরা কিন্তু সংখ্যায় পরিণত হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

কেননা, এদের স্বামীর পরিচয় কেউ জানতে চায় না এজন্যে যে, এই নারীরা স্বনামে এতোটাই আলোকিত যে, স্বামীর প্রতিভার আলো ধার করবার প্রয়োজন পরে না। এক্ষেত্রে নারীরাই যেন সংখ্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে নতুনভাবে।

তবে একথা মানতেই হবে যে, লেখাপড়ার সুযোগ পেলে নারীরাও যেকোনো কাজে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষররেখে দক্ষতার সঙ্গে পুরুষের পাশাপাশি কাজ করে যে, যেতে পারে এরা তাই প্রমান করেছে মাত্র। শুধু এ ক'জননারীই নয় ঘরে ঘরে অনেক নারী স্বাবলম্বি হয়ে উঠেছে এই দশকে। এমনকি কৃষিক্ষেত্রে, বিশেষভাবে গার্মেন্টিস সেক্টরে কাজের মাধ্যমে উপার্জনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার ফলে তৃণমূলপর্যায়ের নারীদের মধ্যে এক ধরণের জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে।

সবচেয়ে বড় প্রমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে, যিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন যে কোনো পুরুষ রাষ্ট্র নায়কের চেয়ে অধিক দক্ষতায়, প্রশংসায়, আপন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির অভিজ্ঞানের বুদ্ধিদীপ্তকর্ম কুশলতায়। জয়তু নারী!!!

তবে এই নারী অগ্রগতির পেছনে রয়েছে এক অদম্য নারীর ইচ্ছাশক্তি। যিনি নিজে নারী। বেগম রোকেয়া ও সুফিয়া কামালের জ্ঞানের মশালে যিনি হাত সেঁকে নিয়েছিলেন, তিনি আমাদের নারী নেত্রী শেখ হাসিনা, জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা।

বিশ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী পালিত হবে। এ জন্যে ১০১ সদস্যের উৎযাপন কমিটি গঠিত হয়েছে। তার প্রথম সভা ইতোমধ্যে হয়েছে।

সারা বছর জুড়েই থাকবে বিভিন্ন কর্মসূচি। এই কুড়ি সালেই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হবে মহাসমারোহে। মেট্রোরেলের কাজ এগিয়ে চলেছে। পদ্মাসেতু অগ্রগতি আমরা সরজমিনে দেখতে পাচ্ছি।

আর কী চাই????

একটাই চাওয়া বর্তমান সরকার ও প্রশাসনের কাছে তা হলো যানজট মুক্তঢাকা শহর। প্রয়োজনবোধে নিরিবিলি একটা জায়গায় দেখে রাজধানী শহরকে স্থানান্তর করা যেতে পারে। ফরিদপুরে হতে পারে সেটি, যেখানে রয়েছে এক মহামানবের শয়নমন্দির।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘুমিয়ে আছেন যেখানে, আমাদের সকল স্বপ্ন নিয়ে তিনি জেগেও আছেন সেইখানে।

স্বপ্ন তার বুক ভ'রে ছিলো
পিতার হৃদয় ছিলো, স্নেহে-আর্দ্র চোখ-

এদেশের যা-কিছু তা হোক না নগণ্য, ক্ষুদ্র
তার চোখে মূল্যবান ছিলো-
নিজের জীবনই শুধু তার কাঁছে খুব তুচ্ছিলো:
স্বদেশের মানচিত্র জুড়ে প'ড়ে আছে
বিশাল শরীর.....
এই সিঁড়ি নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরে,
সিঁড়ি ভেঙে রকিত নেমে গেছে-
বত্রিশ নম্বর থেকে
সবুজ শস্যের মাঠ বেয়ে
অমল রক্তের ধারা ব'য়ে গেছে বঙ্গোপসাগরে।
(এই সিঁড়ি / রফিক আজাদ)

২০ মার্চ ২০১৯
ধানমণ্ডি, ঢাকা

লেখক পরিচিতি
কবি ও গবেষক, প্রাক্তন চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

টেকসই উন্নয়নে কর্মজীবী নারীর ভূমিকা প্রেক্ষিত: বাংলাদেশ

ড. অনিমা রানী নাথ

জাতিসংঘের উদ্যোগে সকল মানুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে একটি অধিকতর টেকসই ও সুন্দর বিশ্ব গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সর্বজনীন ভাবে এক গুচ্ছ সমন্বিত কর্মসূচি গৃহিত হয়েছে। এতে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এসডিজির ১৬৯টি বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা সকল দেশের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। উদাহরণস্বরুপ বাংলাদেশের জন্য ১৫৮টি লক্ষ্যমাত্রা প্রযোজ্য। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ উদাহরণ সৃষ্টিকারী একটি দেশ। দারিদ্র দূরীকরণ, আর্থসামাজিক উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষাক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার কমানো ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। ২০১৫ সালে ২৫ সেপ্টেম্বর বিশ্বের ১৯৩টি দেশের প্রতিনিধিগণ SDGS এ স্বাক্ষর করেন। এর ৫নং লক্ষ্যমাত্রায় বলা হয়েছে "জেন্ডার সমতা আইন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন"। এর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণ, বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ, তথ্য ব্যবস্থাপনায় সকলের অংশগ্রহণ ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ, সুষম ও টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন যথাযথ নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন।

সভ্যতার উৎস মূলে বরাবরই প্রেরণা যুগিয়েছে নারী। প্রাচীন ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বেগম রোকেয়ার মতে, একজন নারী আত্মনির্ভরশীল হলেই তার মুক্তি বা প্রগতি সম্ভব। মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার শ্রেষ্ঠতম, আধুনিকতম দৃষ্টিভঙ্গি বেগম রোকেয়ার চিন্তা-চেতনায় ফুটে উঠেছে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, আত্মজাগরণ, কঠোর পরিশ্রম এবং সংগ্রামের ভেতর দিয়েই নারীকে মানুষ হিসেবে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার পথ খুঁজে নিতে হবে। নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং নারীর আলাদা সত্ত্বার স্বীকৃতি প্রয়োজন। এটি বেগম রোকেয়ার একান্ত নিজস্ব উপলব্ধি। তার এ উপলব্ধির ফলে আজকের নারী এসেছে অনেক দূরে।

নারীর ক্ষমতায়ন শুধু নারী বিষয় কোন ইস্যু নয়। এটি নারী-পুরুষ উভয়ের ফলস্বরুপ। সমাজের প্রতিক্ষেত্রে অসমতা ও বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে পারস্পরিক সমকক্ষতা ও মর্যাদা আনয়নের লক্ষ্যে নারীদের পুরুষের সহযোগিতা করা আবশ্যক। পৃথিবী যখন এক নতুন শতাব্দী দ্বারপ্রান্তে উপনীত ঠিক তখনই সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন। এ সম্মেলনে হিলারি ক্লিনটন উক্তিটি উল্লেখযোগ্যভাবে স্মরনীয় হয়ে রয়েছে। আর্থ-

সামাজিক পরিসরে বাংলাদেশের নারীরা পশ্চাদপদ অবস্থানে। আদর্শগতভাবে বাংলাদেশের নারীদের ভূমিকার নির্ধারিত পরিবারের কর্ম নির্ধারিত হয় প্রাণী স্বরুপ মানব শিশুকে সভ্য মানুষে সামাজিকীকরণ করা এবং প্রকৃতিজাত অপক্ক খাদ্যকে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যে পরিণত করার মধ্যে। সমাজের প্রতিষ্ঠিত ধারণা অনুযায়ী, নারীরা পুরুষের তুলনায় প্রকৃতিগতভাবেই কম যোগ্য এবং তাদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ থাকবে পারিবারিক পরসরে। এক গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশের শতকরা ৭০ জন গ্রামীণ পুরষ ও শতকরা ৮০জন শহুরে পুরুষ নারীদেরকে তাদের চেয়ে কম যোগ্য মনে করেন এবং মাতৃত্বকেই তাদের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা বলে গণ্য করে। পুরুষ প্রধান সমাজের আবর্তের মধ্যে বাংলাদেশের নারীরা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় কম মর্যাদাশীল ও পশ্চাদপদ। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে নারী সমাজের ভূমিকার গুরুত্ব বিশেষভাবে স্বীকার করে নিতে হয়। এ ভূমিকা যাতে বেশি পরিমাণে কার্যকর করা যায় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। নারীর যোগ্য স্থান লাভের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা। শিক্ষাদীক্ষায় পুরুষের মতোই নারী সমাজকে এগিয়ে যেতে হবে এবং শিক্ষার আলোয় নিজেদেরকে যোগ্যতাসম্পন্ন করে তুলতে হবে। ইতোমধ্যেই শিক্ষিত নারীরা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে তারা পুরুষের চেয়ে নিম্নপর্যায়ভুক্ত নন। রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশের নারীরা বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা এমনকি সামরিক ক্ষেত্রেও যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। সমাজসেবা ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও তারা পিছিয়ে নেই। প্রাসঙ্গিকভাবেই যাদের নাম আসে তারা হলেন সুলাতানা রাজিয়া, হেলেন কেলার, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল, মাদামকুরি, মাদার তেরেসা, চন্দ্রিমা কুমারা তুঙ্গা, বেনজীর ভুট্টো প্রমুখ। আমাদের দেশেও শিক্ষিত নারীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য প্রদর্শন করেছেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে নওয়াব ফয়জুন্নেসা, বেগম রোকেয়া, শামসুন্নাহার, মাহমুদ, সুফিয়া কামাল, জাহানারা আরজু, রিজিয়া রহমান, সেলিনা হোসেন, সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে ড. নীলিমা ইব্রাহিম, প্রফেসর হোসনে আরা শাহেদ, রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দিচ্ছেন।

পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হল নারী। একটি সুখী পরিবার গড়ে তুলতেও নারীর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। শুধু একজন মা হিসেবে নয়, একজন স্ত্রী হিসেবে তার ভূমিকা অনেক বড়। কারণ পরিবারের সুখ শান্তির চাবিকাঠি থাকে নারীর হাতে। তিনি তার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার সাথে পারিবারিক জীবনে আনন্দের সঞ্চার করেন। এমন এক সময় ছিল যখন নারীরা শুধুমাত্র সংসারের দায়িত্ব পালন করতেন, আর পুরুষেরা বাইরের কর্মক্ষেত্রের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন। এখন মেয়েরা বাইরের জগতে ছড়িয়ে পড়লেও সাংসারিক দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। সংসারে নারীর ভূমিকার গুরুত্বকে কোনভাবেই উপেক্ষা করা চলে না। সন্তানকে লালন-পালন ও শিক্ষাদানের দায়িত্বসহ ছোট্ট গৃহকোণের শান্তি নীড় রচনার দায়িত্ব একমাত্র নারীর উপর বর্তায়। নারীর ভূমিকা প্রধানত জননী হিসেবে বিবেচ্য। মায়ের কাছ থেকে

সন্তানের যে শিক্ষা লাভ হয়ে থাকে, তা আগামী দিনের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করে। নারীদেরকে এক সময় মনে করা হতো তাদের সার্থকতা একমাত্র তাদের মাতৃত্বে এবং মানব সমাজের জন্য তাদের শ্রেষ্ঠ উপহার হচ্ছে তাদের সন্তান। বর্তমানে নারীর ভূমিকা শুধু গৃহকোণে সীমাবদ্ধ নয়, নারীর ভূমিকা আজ বাইরের জগতেও প্রসারিত। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন কর্মকান্ডে নারীরা জড়িত থেকে জাতিকে এগিয়ে নেয়ার কাজে সাহায্য করছে। লেখাপড়ায় মেয়েদের চমৎকার সাফল্য জাতির ভবিষ্যতের জন্য বিপুল সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। শিক্ষিত নারী সমাজ জাতি গঠণে অনন্য ভূমিকা রাখবে তাতে বিতর্কের সুযোগ নেই। মেয়েরা শিক্ষায় এগিয়ে এসে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হচ্ছে। নারী সমাজের কর্মক্ষেত্রে এখন পুরুষের মতই বৈচিত্রধর্মী হয়ে উঠেছে। ঘর সংসারের মধ্যে আবদ্ধ থেকে নারীরা বর্হি জগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপনের ধারনাটি এখন বাস্তবতার নিরিখে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বিশেষ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে নারীর পদচারণা এখন আর চিহ্নিত নয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী তার কল্যাণকর ভূমিকা পালন করছে। আমাদের দেশে সাম্প্রতিককালে নারী শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় মেয়েরা লেখাপড়ায় এগিয়ে চলেছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণ এখন অনেক স্পষ্ট। তবে শহরের সুযোগ-সুবিধার চেয়ে গ্রামের সুযোগ-সুবিধা কম থাকলেও আধুনিক জীবনের আলোড়ন যে সেখানে পৌছায়নি তা বলার অবকাশ নেই। সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিতে নারী সমাজকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নারী সমাজ উল্লেখযোগ্য অবস্থান গ্রহণ করেছে। শিক্ষকতার সামগ্রিক পেশায় নারী সমাজের অবস্থান সুদৃঢ়। আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডেও নারীরা অনেকাংশে এগিয়ে এসেছে। জীবনের বহু বিচিত্র অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মেয়েরা যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে তা চারদিকে লক্ষ্য করলেই সহজে অনুবাধন করা যায়। কর্মক্ষেত্রের এই বিস্তারের প্রেক্ষিতে জাতীয় জীবনে অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা অগ্রগতি সাধনে সহায়ক বলে বিবেচিত।

আজকাল দেখা যায় পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও কৃষিক্ষেত্রে, শিল্পক্ষেত্রে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। কৃষি ক্ষেত্রে শতকরা ৮৮ ভাগ নারী। গৃহস্থালির কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন শস্য রোপন থেকে শুরু করে তা প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বিক্রয়, গৃহভিত্তিক পশুপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, শাক-সবজি উৎপাদন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে। শিল্প ক্ষেত্রে নারী সমাজের অবদান অপরিসীম। সুস্থিরভাবে লক্ষ্য করলে প্রতিয়মান হয়, শতকরা ৯৫ ভাগ নারী শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত। এমনকি কুঠিরশিল্প, হস্তশিল্প, পোশাকশিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীরাই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এমনকি নারীরা পুরুষের পাশাপাশি মৎস চাষ এবং বিভিন্ন কোম্পানি, ফ্যাক্টরি, ম্যানুফ্যাকচারিং সহ বিভিন্ন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত রয়েছে। এমনকি উৎপাদন খাতেও নারীর পদচারণা লক্ষণীয়। এমনকি কারিগরি বা পেশাদারী হাতে নারীর অংশগ্রহণ শতকরা

১.৭ ভাগ। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও কারিগরির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্যতার ও সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে দেশ বিদেশে সুনাম অর্জন করছে যা দেশের অর্থনীতি এবং সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে।

নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ-সমাজিক খাতে অগ্রগতি অর্জনে উন্নয়নশীল বিশ্বে এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ অগ্রযাত্রার পিছনে অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে মূল স্রোতধারায় সংযুক্তকরণ। বহির্বিশ্বেও আমাদের নারীরা প্রশংসার দাবিদার এমন কি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সফলতার জন্য বাংলাদেশ ২০১৫ সালে "Women in the Parliaments Global Gorum Award" লাভ করে। জাতিসংঘ মহিলা সংস্থা ২০১৬ সালে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে Planet 50-50 Champion সম্মানে ভূষত করে এবং গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফোরাম নারী ক্ষমতায়নে ব্যাপক অবদান রাখার জন্য তাকে "Agent of change Award" প্রদান করে। সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনগণের দোর গোড়ায় সরকারি সেবা পৌছে দেয়া, দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, সমাজের সর্বস্তরে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ এবং একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন নারীবান্ধব নীতি ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই কৌশলসমূহ এমনভাবে গ্রহণ করা হয়েছে যেখানে অবশ্যই নারীর গুরুত্ব রয়েছে। জীবন জীবিকা ভিত্তিক তথ্য এক জায়গায় সহজে খুঁজে পেতে চালু করা হয়েছে বাংরা ভাষার সর্ব প্রথম তথ্য ভান্ডার জাতীয় ই-তথ্য কোষ। জাতীয় ই-তথ্য কোষে ১০ হাজার বিষয়ের মধ্যে নারী অধিকার সংক্রান্ত ৩১০টি বিষয়ই অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এছাড়াও Access to information, A21 প্রকল্পের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে 'জাগরণ' নামে একটি পৃথক কর্ণার করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন, অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সকল প্রকার নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন নারীদের অবাধ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। Representation of The people Order, ১৯৭২ এর ধারা 90 B (b) (ii) এর ফলে জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে যা নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

জেন্ডার ক্ষমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্র অর্জন এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ বেইজিং প্লাটফর্ম ফর এ্যাকশন এবং শিশু সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-সহ সকল আন্তর্জাতিক সনদ অনুসরণে সরকার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৫০টি করা হয়েছে। নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি লক্ষ্যে ইউনিয়ন কাউন্সিল ও উপজেলা পরিষদে এবং পৌরসভায় সংরক্ষিত নারীর আসন এক তৃতীয়াংশে উন্নীতকরণ সহ সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

নারী উন্নয়ন ও সমতার লক্ষ্যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (MDG) ও দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রের (NSAPR) আলোকে নারী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নকল্পে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলাবিষয়ক অধিদফতরের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নারীবান্ধব আবাসিক/অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের সর্ববৃহৎ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী দুস্থ ও অসহায় এবং শারীরিকভাবে অক্ষম মহিলাদের উন্নয়ন স্থায়িত্বের জন্য খাদ্যশস্য ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচী, মাতৃত্বকালীন মৃত্যুহার হ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, গ্রামের দুস্থ, প্রান্তিক, দলিত, আদিবাসী এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসার প্রচেষ্টায় গ্রামভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন, মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিমের আওতায় একটি ভাউচার প্যাকেজের মাধ্যমে অবহেলিত, বঞ্চিত, নিগৃহীত জনগোষ্ঠীকে তিনটি প্রসবপূর্ব চেকআপ, দক্ষ দাইয়ের অধীনে নিরাপদ জন্মদান, একটি প্রসব পরবর্তী চেকআপ এবং যাতায়াত খরচ প্রদান। মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গ্রহণ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কর্মসূচীর আওতায় ৭টি বিভাগীয় শহরে অবস্থিত সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) স্থাপন, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার স্থাপন, দরিদ্র স্বল্পশিক্ষিত বেকার মহিলাদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান, চাকরি-বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্র স্থাপন, ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচী, ডে-কেয়ার সেন্টার, ক্লাবের মাধ্যমে সংগঠিত করে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে কিশোরীদের ক্ষমতায়ন কর্মসূচী, মহিলা, শিশু ও কিশোরীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, ই-সার্ভিস কর্মসূচী, জয়িতা-হালুয়াঘাট বিপণন কেন্দ্র, তৃণমূল পর্যায়ে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ, অসহায়, দুস্থ নারীদের আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে মহিলা সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন, কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় হোস্টেল নির্মাণ, নির্যাতিত নারীদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার স্থাপন, কর্মজীবী মহিলাদের জন্য মহিলা হোস্টেল নির্মাণের মতো বহুমুখী কর্মসূচী বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়াও দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নারী উদ্যোক্তা ক্ষুদ্র সংগঠনের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা বিপণন ও বাজারজাতকরণের সহায়তায় নারীবান্ধব উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রয়াস জয়িতা এবং অঙ্গনা পরিচালিত হচ্ছে। ট্রেনিং ফর ডিজএডভানটেজ ওমেন অন রেডিমেট গার্মেন্টস (আরএমজি) প্রকল্প, শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমি, কম্পিউটার, টেইলরিং, ব্লক ও বুটিক, বিউটিফিকেশন, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং ট্রেডে মহিলারা প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছেন। বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আধুনিক পদ্ধতিতে হাউস কিপিং এ্যান্ড কেয়ার গিভিং এবং বিউটিফিকেশন কোর্সে তাত্ত্বিক ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ

জনশক্তিরূপে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রশিক্ষণার্থীরা নিরাপদ আবাসন সুবিধায় হাতে কলমে নারীবান্ধব পরিবেশ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাগেরহাট, মহিলা হস্তশিল্প ও কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহীসহ এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিরাপদ আবাসিক সুবিধায় বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তাদের দক্ষতার বিকাশ ঘটানো হচ্ছে। কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ গ্রাম-শহরে নারীর কর্মজীবনকে দৃশ্যমান করেছে। দেশের আয়বর্ধক কর্মকান্ড তথা ব্যবসা-বাণিজ্যে নারী সমাজের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রত্যন্ত গ্রামে কম সুযোগ পাওয়া নারীর জীবনে তথ্যপ্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আইন পরামর্শ সহজলভ্য হওয়ার কারণে নারীর জীবনযাত্রার মান ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৯ অক্টোবর ২০১৭ কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত তথ্যানুসারে ১৯৮৩-১৯৮৪ অর্থবছরে দেশের শ্রমশক্তির ৭ শতাংশ ছিল নারী। বর্তমানে তা বেড়ে ৩০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশে নারীর অগ্রযাত্রা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার মূল ভিশন হলো এমন একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে নারী ও পুরুষ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্র সমান সুযোগ ও অধিকার লাভ করবে এবং সব মৌলিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে কোন ধরনের লিঙ্গ বৈষম্য থাকবে না। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ দুটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করেছে। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন-২০১০, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা নীতিমালা-২০১৩, ডিএনএ আইন ২০১৪ এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩-২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। যা বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে মাইলফলক হয়ে থাকবে।

স্বাধীনতা উত্তর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু জাতীয় সংসদে সর্বপ্রথম নারীদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষণ করেছিলেন। এটাই বাংলাদেশের ইতিহাসে নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। যার ফলে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের প্রথম সংসদেই নারীরা প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছিল। পরবর্তীতে সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা ১৫ থেকে ৩০টি উন্নীত করা হয়েছিল, যারা মূলত নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হতেন। ২০০৪ সালের মে মাসে সংবিধানের (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪ প্রবর্তন করে পরবর্তী দশ বছরের জন্য পঁয়তাল্লিশটি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখার বিধান করা হয়েছিল। ৩ জুলাই, ২০১১ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা ৪৫ থেকে বৃদ্ধি করে ৫০টিতে উন্নীত করা হয়েছিল। বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী, সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ

১০ বছর। যা চলতি সংসদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে। এ জন্য একাদশ জাতীয় সংসদ থেকে এই মেয়াদ আরও ২৫ বছর বৃদ্ধি করে আইন পাশ করা হয়েছে। বর্তমানে সংসদে ৭২ জন নারী সংসদ সদস্য রয়েছেন, যার মধ্যে ২২ জন সরাসরি প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়াও প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনে ১২ হাজারের বেশি নারী জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। বিশ্বের সবচেয়ে উদার গণতন্ত্র এবং বৃহৎ অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্রে এখনও কোন নারী প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি। অথচ বহু আগেই দেশ পরিচালনায় নেতৃত্বে এসেছেন বাংলাদেশের নারী সমাজ। গত ২৫ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলের দায়িত্ব পালন করে আসছেন নারী। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী, সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা এবং সংসদের বাইরে থাকা প্রধান বিরোধী দলের নেতাও নারী। জাতীয় সংসদের উপনেতা, স্পিকার, একাধিক মন্ত্রী, এমপি, সচিব, রাষ্ট্রদূত, বিচারক, ডিসি, ব্যাংকের এমডির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করছেন নারীরা। আমাদের সামরিক বাহিনী, পুলিশ বাহিনীতেও নারীরা অবদান রাখছেন। বর্তমানে প্রশাসনে সিনিয়র সচিব ও সচিব পদমর্যাদায় কাজ করছেন মোট ৭৭ জন কর্মকর্তা। শুধু প্রশাসনেই নয়, এমন কোনও ক্ষেত্র নেই যেখানে নারীরা দায়িত্ব পালন করছেন না। দেশের সবখানেই পুরুষের পাশাপাশি নারীরা যোগ্যতার প্রমাণ দিচ্ছেন। আমাদের জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের আমলে ব্যাপকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন বিশেষজ্ঞরা। বিশ্বে অন্য কোন দেশে রাজনীতিতে নারীর এত উচ্চাসন নেই। এর স্বীকৃতিও মিলেছে বিশ্বজুড়ে। নারী উন্নয়ন ও সমতার লক্ষ্যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল ও দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রের আলোকে নারী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নকল্পে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ মহিলাবিষয়ক অধিদফতরে ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে রাজস্ব ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য জাতীয় বাজেটে নারীদের জন্য রয়েছে আলাদা বরাদ্দ। ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রথমে চারটি মন্ত্রণালয়ের জন্য জেন্ডার বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছিল, ওই বছর নারী উন্নয়নে বরাদ্দ ছিল ২৭ হাজার ২৪৮ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল এক লক্ষ ১২ হাজার ১৯ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ২৭.৯৯ শতাংশ এবং জিডিপির ৫.০৪ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে নারী উন্নয়নে বরাদ্দ ১ লাখ ৩৭ হাজার ৭'শ ৪২ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ২৯.৬৫ শতাংশ এবং জিডিপির ৫.৪৩ শতাংশ। এছাড়াও নারীর ক্ষমতায়নসহ তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ৭৯৫ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বিগত বছরগুলোর বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যায়, গত সাত বছরে নারী উন্নয়নে বরাদ্দ পাঁচগুণেরও বেশি বেড়েছে। যা নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। সরকারের এসব কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা 'দ্যা স্ট্যাটিসটিক্স' তাদের প্রতিবেদনে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ

হাসিনাকে বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেছে। নারী শিক্ষা ও নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রগতি অর্জনের স্বীকৃতি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারী সংস্থা 'দ্য গ্লোবাল সামিট অব উইমেন' এর পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'গ্লোবাল উইমেন্স লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়েছে। বিশ্ব গণমাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের সাফল্যের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। আজ থেকে এক শতাব্দীর বেশ কিছু আগে এমন স্বপ্নই দেখেছিলেন নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। ১৯০৫ সালে তাঁর রচিত 'সুলতানার স্বপ্ন' নামের বইটিতে কল্পনায় তিনি এমন একটি দেশ চেয়েছিলেন, যেখানে সবকিছুর নেতৃত্বে থাকবেন নারী। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেই লক্ষ্যে অনেকদূর এগিয়েছে। সমাজের সার্বিক কল্যাণ, সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন, মানবিক মূল্যবোধ লালন, ধারন ও পালন করে শুধুমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠানে নয়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও আইএনজিওতেও নারীরা তাদের দক্ষতা এবং প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে এ দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে যা টেকসই উন্নয়নে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

সূত্র:

- নারীর ক্ষমতায়ন, রেহেনা বেগম রানু, ২০১০;
- সমাজ ও নারী, সমকালীন প্রসঙ্গ, ড. কাশফিয়া আহমেদ, ২০০৭;
- নারী ও বাংলাদেশের অর্থনীতি, হান্নান বেগম, ২০০৯;
- Islam Mahmuda "Women at Work in Bangladesh" In women for women, Dhaka University press-2010;
- নারী উন্নয়ন বার্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-১৯৯৯;
- জেন্ডার সংবেদনশীলতা: বাজেট ২০১৭-১৮;
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ বাস্তবায়নকল্পে, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

লেখক পরিচিতি

যুগ্ম-সচিব

খাদ্য মন্ত্রণালয়।

ম্যাগি

বনানী বিশ্বাস

আমাদের চলারপথের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে কতযে বিচিত্র ঘটনা প্রবাহ লুকিয়ে আছে তা মনে হয় বিধাতাই জানেন। আমার এ ক্ষুদ্র জীবনের ঘটনাই যদি বলি তাহলে ও হয়ত এক একটি মহাকাব্য রচনা হতে পারে। অথচ আমি নিতান্তই গোমূর্খ একজন, মানুষ বললেও বলতে পারেন আবার নাও বলতে পারেন। সে ভার আমি আপনাদের উপরই ছেড়েদিলাম। আজ বিকেলে যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটির ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। তবে হলফ করেই বলতে পারি এমন অসম্ভব ঘটনা ঘটতে পারে তা আমি কল্পনাই করতে পারিনি।

আমার পোশাকি নামটা বড়ই কেতাদুরস্ত। শুভাগমন বনিক। বনিক পরিবারের শুভ আগমন। অথচ বিশ্বাস করুন আমি আসাতে আমার বাবা মায়ের পরিবারে কোন ভাগ্যোন্নয়ন হয়নি। বরং এ নামের যন্ত্রণা আমাকে পদে পদে পোহাতে হয়েছে। সবাই আমাকে ডাকে শুভ বলে। পদ্মানদী তীরবর্তী পলাশতলি গ্রামে আমার জন্ম হয়েছিল। শিক্ষক পিতার পরিবারে সপ্তম সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তান আমি। দরিদ্র কিষ্ট পরিবারে চরম অবহেলা হতে পারত আমাকে নিয়ে। কিন্তু হয়নি, কেননা সবশেষে ও আমি একজন ছেলে সন্তান। তাই খুব আনন্দ হৈচৈ নাহলেও মা, কাকিমারা আমাকে অবহেলা করেননি। তাই মোটামুটি আদর ভালোবাসায়ই আমি বেড়ে উঠেছি।

তখন আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি। প্রবল বন্যায় প্রমত্তা পদ্মা। সর্বগ্রাসি ক্ষুধা নিয়ে সে ঝাপিয়ে পড়েছে তারই কুল ঘেসে বেঁচে থাকা নিরীহ জনপদের উপর। পদ্মা আমাদের সহ হাজার হাজার মানুষকে গৃহহারা করল। আমার বাবা একটি স্কুলে চাকরি নিয়ে শহরতলিতে চলে আসল আমাদেরকে নিয়ে। আমাদের এক নতুন জীবন শুরু হল। কি হতে চেয়েছিলাম আর কি হতে পেরেছি সে এক গল্প। আমি বিএ পাশ করে অদূরে মধুপুর নামক গ্রামে স্কুলে সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি পাশাপাশি এমএ টাও চালিয়ে নিচ্ছি।

এখানে এসে আমি একটি বাড়িতে জায়গির থাকি। এ বাড়ির কর্তার দুটো ছোট ছেলে আছে। আমি তাদের পড়ালেখার ভার নিয়েছি। স্কুল থেকে বাড়ির দূরত্ব এক কিলোমিটারেরও বেশি। আমি বাড়ি থেকে হেঁটে স্কুলে যাই। এ গ্রামে রাস্তা বলতে তেমন কিছুই নেই। জমির আইল, ঝিলের পাড় দিয়ে স্কুলে যেতে হয়। নির্ভেজাল ও মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য স্কুলে যাওয়ার দুপাশে। মাঝপথে একটা বাঁশের সাকো পার হতে হয়। তখন আমি স্কুল থেকে ফিরছি। কিছুটা আনমনে যেতে যেতে হঠাৎ পানির

উপর কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ পেলাম সর্বনাশ! একটা বাচ্চা পানির মধ্যে পড়ে গেছে। আমি কিছু ভেবে পেলামনা। ঝাঁপ দিলাম পানির ভিতর। বাচ্চাটিকে টেনে নিয়ে ডাঙায় তুললাম। বাচ্চাটি খুব ছোট নয়। এগার বার বছরের একটি মেয়ে বাচ্চা। সে আমাকে দেখে ভয়ে জড়োসরো হয়ে বসে আছে। আমি বললাম খুকি তোমার বাড়ি কোথায়। ও ঐ দিকে আঙুল দিয় দূরে কোথাও দেখিয়ে দিল। নাম জিজ্ঞেস করায় সে বলল তার নাম শৈল। সাঁতার জান? সে বলল জানে। বললাম খুকি বাড়ি যাবেনা? বলার সাথে সাথেই সে তার স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে চলে গেল। আমি ভিজে অবস্থায় বাড়ি ফিরি।

আমি রোজই এ পথে স্কুলে যাই। ফেরার সময় খেয়াল করি শৈল তার সঙ্গী সাথিদের নিয়ে রাস্তার পাশে খেলা করে। আমি তাকে কাছে ডাকি। প্রথম প্রথম জড়তা ছিল, আস্তে আস্তে সেটা কেটে গেল। এখন সে আমাকে দেখলেই দৌড়ে আসে। বিভিন্ন কথা বলে। সে কাস ফোরে পড়ে। না পড়ার মত। রেগুলার স্কুলে যায়না। ওর মা বারণ করে দিয়েছে। গরিবদের নাকি এত লেখাপড়া করতে নেই। আমি ওকে বললাম তুই লেখাপড়া করতে চাস? শৈল তার বড় বড় চোখ তুলে বলল স্কুলে যেতে তার খুব ইচ্ছে করে। তার এখানে ভালো লাগেনা। বস্তির মত জায়গা, চারিদিকে নোংরা। তার একটুও ভালো লাগেনা। তার খুব ইচ্ছে করে সুন্দর জামা পড়ে, কাঁধে ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যেতে। তার অনেক বড় হতে ইচ্ছে করে। কি হতে হবে সে জানেনা। সে এটুকু জানে সে অনেক বড় হলে তাকে আর নোংরা জায়গায় থাকতে হবেনা। আমি শৈলর কথা শুনে ভীষণই অবাক হলাম।

সেদিন শৈল আমার মনকে নাড়িয়ে দিল। ভাবছি কি করে এই শিশুর অদম্য ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করা যায়। শৈলোর মধ্যে আমি ফুলের মূল্যের ম্যাগিকে দেখলাম। কি করে শৈল এ অজপাড়াগায়ে বসে এক অধরা স্বপ্নের বীজ বুনল। গোবরে পদ্মফুল। সার জল পেলে সত্যি একটা পদ্মফুলই হয়ত হত। ভাবছি আমি কি পারিনা ওর ভিতরের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলতে? পরের দিন ও শৈলোর সাথে দেখা হল। আমি ওর হাতে দুটো খাতা পেন্সিল কিনে দিলাম। আর বললাম শোন রোজ স্কুলে যাবি আর পড়ালেখা করবি। আজ থেকে আমি তোকে ডাকব ম্যাগি বলে।

প্রতিদিনই স্কুল থেকে ফেরার পথে আমার চোখ দুটো ম্যাগিকে খোঁজে। কিন্তু আজ তার দেখা পেলামনা। ওর সঙ্গী সাথিরা আছে কিন্তু ম্যাগি নেই। ভাবলাম কোন কারনে হয়ত ও আসতে পারেনি। এমনিভাবে আট দশদিন হল আমি ম্যাগির (শৈল) দেখা পেলামনা। এবার আমি বিচলিত বোধ করলাম। কিছু হলোনাতো মেয়েটার? আমি ওর সাথিদের শৈলর বিষয়ে খোঁজ নিলাম। ওরা তেমন কিছু বলতে পারলনা। ওদের বললাম আমাকে নিয়ে যাবে ওদের বাড়ি? ওরা নিয়ে গেল। শৈলকে ডাকা হলো। শৈল আসলনা, ওর মা আসল। আমাকে দেখা মাত্র সে তার গ্রাম্য ভাষায় যা

বলার তাই বলল। তার অর্থ ছিল আপনি বই খাতা দিয়ে আমার মেয়ের মাথাটা খাচ্ছেন, ওর কি কোনদিন বিয়ে হবে? তাই ঐ বই পত্র আমি পুড়িয়ে ফেলেছি। আর আমি যেন কোনদিন এমুখো না হই। আমরা শৈলোর বাবা মা, আমরাই ওর ভালো বুঝব। আপনাদের মত শহুরে মানুষ আমাদের চেনা আছে। আপনি কি পারবেন শৈলকে বিয়ে করতে? আমরা শৈলোর বিয়ে ঠিক করেছি।

আমার দুকানের মধ্যে মনে হল শিশে ঢেলে দিয়েছে। "আপনি কি পারবেন শৈলকে বিয়ে করেতে? আমরা শৈলোর বিয়ে ঠিক করেছি" বার বার মাথার মধ্যে কথাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু এর সমাধান সত্যি আমার জানা নেই। নিজেকে ধিক্কার দেই। কেমন শিক্ষক আমি যে সমাজে বাল্যবিবাহ রোধে কোন শিক্ষা দিতে পারিনা। না আর না, আমি আসলে শিক্ষক নামের কলঙ্ক। নিজেকে ব্যক্তিত্বহীন কুপগন্ডুষ মনে হল। আরও যত খারাপ বিশেষণ আছে সবই আমার প্রাপ্য। আর যাই হোক শিক্ষকতা আর করাবোনা। শিক্ষক হিসেবে যদি কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের অন্ধকারই দূর করতে না পারি, ধিক আমার এ শিক্ষকতাকে। ইচ্ছে হচ্ছে নিজের নামটাই পাল্টে ফেলি। শুভাগমন! শুভবিদায় হলেই ভালো হত। তল্পিতল্পাসহ পরেরদিন চাকরি ইস্তফা দিয়ে চলে এলাম। বাবা দেখে খুব কষ্ট পেল। অবসর জীবনে হয়ত সংসারের একটু হাল ধরতে পারতাম। তা আর হলনা।

আমার বড় ছেলেকে তার স্কুলে ড্রপ করে আমি সচিবালয়ে আমার অফিসে ঢুকলাম। সরকারের একটি দায়িত্বশীল পদে আমি আছি। ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম। তখন বিকেল চারটা বেজে আরও কিছুসময় হবে। আধুনিক পরিপাটি করা একজন সুদর্শণা দরজা খুলে বলল স্যার আসব? আসুন বলে কাজে মন দিলাম। সুদর্শণা বলল বসব স্যার? হু বলে আবার ব্যস্ত হলাম। মেয়েটি আমার টেবিলের সামনে চুপচাপ বসে আছে। কিছুণ পরে মেয়েটি বলল যাই স্যার। এবার আমি ওর দিকে তাকালাম। কেমন যেন পরিচিত মুখ বলে মনে হল। বললাম এসেছিলে, কিছু বলবে কি? মেয়েটি দাড়িয়ে বলল স্যার আমি শৈল। শৈল? কোন শৈল, কে সে? ও বলল স্যার আমি ম্যাগি। ঠিক সেই মূহুর্তে আমার হাত পা যেন অবশ হয়ে গেল। আমি কি ঠিক আছি? এওকি সম্ভব? শৈল অত আধুনিক একটা স্মার্ট মেয়ে হয় কি করে? আমি ভুল শুনছিনাতো? পঁচিশ বছর! বড্ড দীর্ঘ সময়! এর মাঝে পৃথিবীতে কত প্রলয় ঘটে কত নতুন কিছুর জন্ম হয়ে গেছে আমি তার কত টুকু খবরই রাখি। আমার পায়ের নিচে মাটি সরে যেতে থাকল। আমি ধপাস করে বসে পড়লাম। গ্লাস থেকে পানি খেলাম। ও বলল স্যার আপনার কি শরীর খারাপ, আমি বললাম না।

যেদিন ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম, ঐ সপ্তাহেই শৈলর বিয়ে হয়ে যায়। তার ঘরে আরও দুটি বউ আছে, আছে ওরই বয়সি ছেলেমেয়ে। সে এক নরকযন্ত্রণাময় জীবন কাহিনী। বিয়ের পাঁচমাসের মাথায় ওর স্বামী মারা যায় অসুখে। তখন ও ওর খেলার

বয়স যায়নি সেই বয়সে ও বিধবা। আমি আর ভাবতে পারছিনা। ইচ্ছে হচ্ছে বলি থাম এমন অপদার্থের কাছে এগুলো আর বলোনা। বিধবা হওয়ার পরেই যেন শৈল হঠাৎই অনেকটা বড় হয়ে গেল। সে এবার স্কুলে যায়। তারতো আর হারাবার ভয় নেই। মায়ের বকুনিকে উপেক্ষা করে সে স্কুলে যায়। সে খুবই মেধাবি ছাত্রী ছিল। টিউসনি, ছুটা চাকুরি করে শৈল পড়ালেখা শেষ করেছে। ঢাকায় সে একটা প্রাইভেট স্কুলে চাকুরি করায়। পাশাপাশি বিসিএস দিয়ে সে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন ক্যাডারে চাকুরি নিয়েছে। তাও দুবছর হয়ে গেল। আমাকে সে খুঁজেছে। আজ তার সাথে আমার দেখা হল। আমি কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে গেলাম। মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোলনা।

মনে মনে ভাবলাম ম্যাগিকে, বস্তিতে থাকতে তার ভালো লাগেনা। সচিবালয়ে যেখানে কোন নোংরা ডাস্টবিন নেই, সেখানে চাকুরি করতে তার ইচ্ছে। ম্যাগির মনের এই অদম্য ইচ্ছে শক্তির জয় হয়েছে।

আর আমি? কি মনে করেন আমি কি সত্যিই শুভাগমন?

লেখক পরিচিতি
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (উপসচিব)
জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ।

প্রাপ্তি (অনুগল্প)

ইসরাত বানু

প্রতিদিন বিকেলবেলা মায়ের খাটে একটু শোয় নিশিতা। তা শীত হোক বা গরম হোক। নিজের রুমে সারাক্ষণ থাকলেও মায়ের কাছে একটু না থাকলে ওর ভালো লাগে না। ওর ফর্সা, সুন্দর মায়ের মুখের দিকে তাকালেই দুনিয়ার শান্তি। মা যে ওর চেয়ে খাটো এনিয়ে মজা করে সে প্রতিদিন। আজ শুয়েছে বেশ খানিকটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে। কিছুদিন থেকে বাপী আর মা সারাক্ষণ বিদেশে এম এস করতে যেতে বলছে। কিন্তু ও কানে নিচ্ছে না। মায়ের চিৎকারে স্কলারশিপের আবেদন করেছে। হয়ে যাবে সুইডেনে। কিন্তু বাপী আর মাকে বলে নি। তার যে আরেকটা বড় কাজ বাকী। এমুহূর্তে ইয়াসিরকে বিয়ে না করে সে কোথাও যাবে না। ও যেমন বাপী আর মাকে বলেনি, ইয়াসিরও বলেনি তার মা বাবাকে ওদের রিলেশনের কথা। ইয়াসির ওর বাপীর বন্ধুর ছেলে। ছোটবেলা একসাথে খেললেও অনেকদিন দুই শহরে ছিল। সম্প্রতি ইয়াসিরের বাবা বদলী হয়ে ঢাকা এসেছে। আবার দুই পরিবারের যাতায়াত শুরু। ইয়াসির মাত্র মালয়েশিয়া থেকে পড়া শেষ করে দেশে এসেছে। এই সময়ে বাসায় বিয়ের কথা বলাও বেশ ঝামেলার। তবু নিশিতার কথায় রাজী হয়েছে। যেহেতু বাবারা বন্ধু, সেহেতু ওদের বিশ্বাস ঝামেলা হবে না।

নিশিতা শুয়ে শুয়ে মা কে দেখছে। ওর মা বিকেলে খাতা দেখছেন। মার মনে হয় খাতা জমা দেবার তাড়া। ওর দিকে তাকাচ্ছে না। হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো নির্দিষ্ট রিং টোনে। নিশিতা দৌড়ে নিজের রুমে। ইয়াসির উত্তেজিত। কিছুটা হতাশ গলায় বললো, ওর বাবা বিয়েতে রাজী না। ওর বাবা বলেছে নিশিতা তার বাবা মার বায়োলজিক্যাল মেয়ে নয়। কার না কার মেয়েকে তারা পুত্রবধু মানবে না।

ইয়াসির বার বার বলছে, "চিন্তা করবে না ডিয়ার, আমি ঠিক ওদের রাজী করাবো। তুমি কার মেয়ে তা আমার না জানলেও চলবে। আমার জীবন আমার।" নিশিতার কানে কিছুই যাচ্ছে না। ছোটবেলা সে অনেকের কাছে শুনেছে তাকে কুড়িয়ে এনেছে। সব বাচ্চা এটা শুনে। সে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো কিন্তু বাপী আর মা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে। আজ জানলো সত্যটা ।

মার রুমে ঢুকে সে মায়ের পাশে দাঁড়ালো। মা বললো, কিরে, কি হয়েছে?

কেমন উদভ্রান্ত হয়ে নিশিতা বলছে, "মা, আমি সুইডেন যাবো। বাপকে বলো সব ঠিক করতে"। গলার স্বরের কাঁপুনীটা আনন্দের না কষ্টের মা বুঝতে পারছে না। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন মেয়ের দিকে।

লেখক পরিচিতি

সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, টংগী সরকারি কলেজ।

SDGs এর প্রেক্ষাপটে নারী ভাবনা

মালেকা আক্তার চৌধুরী

সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অপার রহস্যে ভরপুর রক্তে মাংসে গড়া মানুষ। মানব-মানবী অর্থাৎ নারী-পুরুষ সেই প্রক্রিয়ারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। পুরুষ শাসিত সমাজে যুগ-যুগ ধরে নারীকে নারীরূপেই দেখা হয়েছে.... মানুষ হিসেবে নয়, সংগ্রামই যাদের পরমপাথেয়; পরাজিত, অবহেলিত, নির্যাতিত হওয়াই যাদের এক সময় কার নিয়তির লিখন। কখনও বা হেরে যেতে যেতে সে নারী জ্বলে ওঠে সহসা, পরখ করে দেখতে চায় জীবনের চ্যালেঞ্জ কে। শুধু এশিয়া মহাদেশে নয়, সৃষ্টির উষা লগ্ন থেকেই দেশে দেশে, সমাজে সংসারে নারীকে বাড়তে দেয়া হয়নি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে। পদে পদে শৃঙ্খলিত আর সমাজের আরোপিত বিধি-নিষেধের জালে নারী রয়েগিয়েছে দুর্বল, ভঙ্গুর আর মেরুদন্ডহীন। তারা এক সময়ে ছিলো অসূর্যম্পশ্যা... প্রকৃতি নির্ভর আদিম সমাজের মানুষদের মধ্যে কোনো রকম বন্ধন ছিলোনা... ছিলো অবাধ যৌনাচার। নারীকেতার দৈহিক কাঠামোগত কারণেই পুরুষের চেয়ে দুর্বল ভাবা হতো.... নারীর উপর সেভাবেই আরোপিত হয় গার্হস্থ্য জীবনের দায়িত্ব, আর সন্তান লালন পালনের মহৎ কর্মটি। না, আমি বলছিনা, নারী আজও সেই অবস্থা থেকে নিজেদের পুরোপুরি উত্তরণ ঘটাতে পেরেছে... তবে হ্যাঁ, আজকের কর্পোরেট নারীরা শিক্ষা-দীক্ষায়, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে অনেক বেশি এগিয়ে, অনেক বেশি ঈর্ষণীয় পর্যায়ে রয়েছে। এমন অবস্থা একদিনে তৈরি হয়নি... এ পর্যায়ে কবি ঈশ্বরগুপ্তের একটিমৃদু ব্যাঙ্গাত্মক কবিতার অবতারণা করতে চাই :

"আর কীতাদের তেমনপাবে
যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন "এ বি" শিখে, বিবি সেজে
বিলাতী বোল কবেই কবে।"

(দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ২৮, ১ম ও ২য় সংখ্যা আবু জাফর মো: সালেহ পৃ: ২)

তবে একথা ঠিক, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে রেঁনেসার প্রভাবে নারী জাগরণের প্রসার ঘটে। কিন্তু নারী ভাগ্যে জড়িয়ে থাকে চরম বিড়ম্বনা- কখনও ধর্মীয় প্রভাব, কখনও বা সমাজ পতিদের দখল দারিত্ব মনোভাবের হিংস্রতার কাছে নারীরা শোকেছের সাজানো অবগুণ্ঠিত একটা খেলনা বৈ কিছুই ছিলোনা। পর্দা প্রথার আড়ালে চলতো পুরুষতান্ত্রিকতার দাম্ভিকতা। মনে আছে, কিশোরী বেলায় 'অয়োময়' নাটকে প্রখ্যাত টিভি নাট্যাভিনেত্রী সুবর্ণা মোস্তফা কোনো এক দৃশ্যে তার সঙ্গীনিকে

বলেছিলেন " জানিস, পর্দা করতে হয় নিজেদের লোকের সামনে" সুতরাং আমরা বলতেই পারি, নারী নিজে অন্তরীণ থাকতে রাজি নয়। নারীকে ছলেবলে কৌশলে- নানান দায়িত্বের বেড়াজালে তাকে অন্তরীণ করে রাখাই ছিলো পুরুষতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। প্রকৃত শিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা নারীকে পুরুষের সাথে সমানতালে চলার পথে অন্তরায় করে রেখে ছিলো।

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে নারী শুধু নারী নয়, সমাজের - রাষ্ট্রের এক গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য অংশ। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারীর সমতা রক্ষায় সরবরহ হওয়ার মাধ্যমে নারীর জন্য উন্নত নিরাপদ একটি বিশ্ব গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। নারীদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন তথা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে সকলকে অব্যাহত ভূমিকা রাখতে বলেন। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, এমডিজি (Millennium Development Goal) থেকে এসডিজিতে (Sustainable Development Goal) উত্তরণ এবং তার বাস্তবায়ন সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা দরকার। এমডিজি এর লক্ষ্য মাত্রাঅর্জন সফলভাবে শেষ হলেও কিছু বিষয়ে অস্পষ্টতা থেকে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘের নতুন উদ্যোগ শুরু হয় এসডিজি (Sustainable Development Goal)। এর লক্ষ্য নির্ধারিত হয় ২০৩০ সালের মধ্যে সার্বজনীন উন্নয়ন। উল্লেখ্য, ১৯১০ সাল থেকে নারী শ্রমিকদের দাবি আন্দোলনের ইতিহাসকে স্বীকৃতি প্রদানকরে ৮ মার্চ পালিত হয় বিশ্ব নারীদিবস। ৮ মার্চের প্রেক্ষাপটকে অধিক গুরুত্ব প্রদানের লক্ষ্যে বৈশ্বিক পর্যায়ে নারীর সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অধিকারকে জোরদার করার দাবি পুনব্যক্ত করাহয়। নারী-পুরুষ সমতা, বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সরকারের দায়বদ্ধতার ক্ষেত্র তৈরি করেছে ৮ মার্চ। নারীর ক্ষমতায়ন, মানবতার উন্নয়ন; প্ল্যানেট ৫০-৫০: স্টেপ ইট আপ ফর জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি- এসব প্রতিপাদ্যই প্রমাণ করে এসডি জিতে নারী ভাবনার দুয়ার কতোটা উন্মুক্ত।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সমাপ্তির পর ২০১৫ সালে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত একটি টেকসই বৈশ্বিক রুপান্তরের উদ্দেশ্যে সতেরটি লক্ষ্য চিহ্নিত করে এসডিজি গৃহীত হয়। এসডিজির পাঁচ নাম্বার লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে'নারী ও কন্যা শিশুর সমতা অর্জন তথা নারীর ক্ষমতায়ন'। ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক UN Sustainable Development Summit এ বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানদের আলোচনার মাধ্যমে এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। সম্মেলনের বিষয়বস্তু Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goal.

বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রাগুলো পুরোটাই দর্শনভিত্তিক। স্বাধীনতা,

সাম্য-মানবাধিকারের কথা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে নারীর জন্য বৃহত্তর ক্ষেত্রে কর্ম পরিধি রচনা। নারীদের এক বিরাট অংশ আজও সুবিধা বঞ্চিত। এখনও ৬০ শতাংশ নারীর ১৮ বছরের নিচে বিয়ে হয়। সামাজি কসংস্কার, কু-প্রথা তথাকথিত গাঁয়ের মোড়লদের স্বেচ্ছাচারিতার কাছে নারীরা আজও বন্দী। শিকার হচ্ছে সহিংসতার, ঘরে-বাইরে, কর্মস্থলে সর্বত্র। সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের যে ঈর্ষণীয় সাফল্য রয়েছে তার অগ্রগতিতেও রয়েছে নারী। তবুও বৈষম্যের শিকার নারীরা। যৌন নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, ফতোয়ার শিকার, আত্মহত্যা, নারীর শারীরিক-মানসিক নির্যাতন ভয়াবহ রূপে বেড়েই চলছিলো... ঘরেই নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। সর্বংসহা নারীকুল এবার জেগে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। তবে নারী উন্নয়নকে টেকসই করতে হলে নারী উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষকে সম্পৃক্ত করতে হবে। কারণ নারীর অনুন্নয়ন বা পিছিয়ে থাকার জন্য আমাদের পুরুষেরাই অনেকাংশে দায়ী। নিজগৃহে যে পুরুষ সংস্কারাচ্ছন্ন তিনিই বাইরে মুক্ত মনের, মুক্ত চিন্তার উদার মনের আদর্শিক একজন মানুষ.... তিনি সহজেই তার কর্মপরিবেশে, সমাজে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে যাচ্ছেন। কেনো এমন দ্বৈত-আচরণ। নারীকে সবক্ষেত্রে অবরুদ্ধ রাখার সিস্টেমগুলোতো সমাজ পতিদেরই সূক্ষ্ম কূট-কৌশল। এসব প্রথাগত সংস্কার থেকে বেরিয়ে এসে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রায় ব্যাপক হারে নারীদের প্রশিক্ষণ ও কমসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। নারীকে বৈশ্বিক নাগরিকের মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে, এক্ষেত্রে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "জাতীয় পর্যায়ে এসডিজি লক্ষ্যকে সমন্বিতভাবে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এবং এর কার্যক্রম মনিটর করার জন্য বাস্তব ভিত্তিক পদক্ষেপ নিতে হবে। নারী-পুরুষ, নাগরিক সমাজ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, যুব সমাজ সহ সবার সঙ্গে অংশিদারিত্ব আলোচনা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য আমি দক্ষিণ এশিয়ার পার্লামেন্টগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি গড়ে তুলতে চাই"। (১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, ডেইলি ইনকিলাব)

একথা বলাই বাহুল্য যে, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেশে একটা বিপ্লব ঘটে গিয়েছে; এই বিপ্লবে নারীদের অংশিদারিত্ব উল্লেখ করার মতো। নারীরা আজ আর থেমে নেই, পায়ে পায়ে চলে এসেছে অনেকটা পথ। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা প্রগতির পথে, অগ্রগতির সোপানে নারীকে পৌঁছে দিয়েছেন এক অন্য মাত্রার উচ্চতায়। তৃণমূল পর্যায় থেকে কন্যাশিশু, কিশোরী, তরুণী, মধ্যবয়স্কা নারী সকলের জন্যই বৈশ্বিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রটি অবারিত। বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন আজ সফল হতে চলেছে .. বাংলার অবলা নারীরা আজ সবল-সামর্থ্য বান হয়েছে।

রাষ্ট্রপরিচালনা থেকে শুরু করে প্যারাসুট জাম্পিং, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, বৈমানিক,

পিসকিপিংয়ে নেতৃত্বদান, ক্রিকেট বিশ্ব, অ্যাথলেট পাড়া থেকে হিমালয় চূড়া পর্যন্ত কোথায় নেই নারীর পদ চারনা।

বৈশ্বিক নারী-অবাধতার বিচরণ, প্রতিটি ক্ষেত্রে সে তার মেধা-মনন-যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। তবে নারীর এ পথ চলাকে নিষ্কণ্টক আর অবারিত করতে হলে পুরুষ সদস্যকেও নারীর পাশে ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে দাঁড়াতে হবে। নারী উন্নয়নকে টেকসই করতে হলে নারী উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষকে সম্পৃক্ত করতে হবে। নারীকে প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, সহযোগী ভেবে কাঁধেকাঁধ মিলিয়ে স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে শপথ নিতে হবে।

লেখক পরিচিতি
অধ্যাপক, দর্শনবিভাগ
সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা।

শিশু মনস্তত্ত্ব এবং আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা

ড. মালেকা বিলকিস

শিশুর আবার মনস্তত্ত্ব কি? ওরা তো অবুঝ। জন্মের পরে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে দেখে দেখে তার কচি মনের সাদা দেয়ালে একটু একটু তুলির পরশ বুলিয়ে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ায় শিশু সমাজ উপযোগী হয়ে উঠে। এজন্য আমরা শিশু পালনের ক্ষেত্রে শারিরীক পরিচর্যাটাকেই প্রাধান্য দিই। মনস্তত্ত্বিক দিকটার কথা মোটেও আমলে আনিনা। আসলে শিশুর মনস্তত্ত্বের দিকটা শুধু বই পুস্তকেই এখনো সীমাবদ্ধ আছে। পারিবারিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় এর প্রয়োগ নেই বললেই চলে। অথচ উন্নত দেশগুলি শিশু মনস্তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ ঘটায় বিভিন্ন অঙ্গনে। আমাদের দেশে একজন এমপির 'আমেরিকার ডায়েরি' বইটি পড়ে জানলাম তিনি একটি ফেলোশীপ প্রোগ্রামে আমেরিকার শিকাগো শহরের উপকণ্ঠে একটি বাড়িতে অতিথি হিসেবে ছিলেন। বাড়ির মালিকের চার বছর বয়সী বাচ্চার স্কুল ভিজিট করতে গিয়ে শিক্ষকদের শিক্ষাগত মান দেখে তিনি অবাক। স্কুলের সব টিচার উচ্চশিক্ষিত। এমনকি বেশিরভাগই পিএইচডি ডিগ্রীধারী। এত ছোট শিশুদের শিক্ষা দিতে পিএইচডি শিক্ষকের দরকার কেন? আসলে তারা সবাই মনোবিজ্ঞানে পিএইচডি। কারন শিশু মনস্তত্ত্ব না বুঝতে পারলে সেসব শিশুরা বড় হয়ে সমাজ উপযোগী আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবেনা।

বিপরীতে আমরা কোন অবস্থায় আছি? আমাদের দেশে শিশুদের স্কুলে যেনতেন শিক্ষায় শিক্ষিতরাই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে পারে। তাদের বেতন কম। তাই উচ্চশিক্ষিত মেধাবীরা সেখানে যাবে কেন? একটি বহুতল ইমারত নির্মানের ভিত্তিটি যদি মজবুত না হয় তাহলে উপরের দিকটা যত মজবুতই হোকনা কেন তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এই সাধারন সত্যটি আমরা বাস্তবায়নে ব্যর্থ। আমার জনৈক সহকর্মী জেলা শহরের একটা বিখ্যাত প্রাথমিক স্কুলে ছোট বাচ্চাকে ভর্তি করিয়েছিলেন দীর্ঘদিনের অনেক শ্রম এবং ধৈর্য্য খরচ করে। শিশুটিও খুব আনন্দিত ঐ স্কুলে ভর্তি হয়ে। একদিন স্কুল ছুটির পর তিনি দেখলেন স্কুলের সব বাচ্চাদের ছুটি হলেও তাঁর বাচ্চা সহ আরো দুতিনটা বাচ্চা ফিরছেনা। অনেক কসরত করে তিনি গেট পেরিয়ে বাচ্চার ক্লাসরুমের জানালার ফাঁক গলিয়ে যে দৃশ্য দেখলেন তাতে দেরী না করে গেটের বাইরে পূর্বের স্থানে চলে এলেন। কারন ক্লাস টিচার বাচ্চাদের দুস্টুমি করার অপরাধে তাদেরকে হাঁটুর ভিতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দুকান ধরে বিশেষ কায়দায় বসিয়ে রেখেছেন। যেটাকে বলে মুরগী বানানো। খুব কষ্টকর একটা কসরত। আমার সহকর্মী এটাকে শারিরীক কষ্টের চেয়ে মনোকষ্টের ব্যাপার হিসেবেই দেখেছিলেন। বাচ্চাটি যদি জানতো তার মা এই দৃশ্য দেখেছে তাহলে

হয়ত সে সারা জীবন মায়ের কাছে কোনঠাসা হয়ে থাকতো। নয়তোবা মা যদি বাসায় ফিরে সেই শাস্তির কথা বলে কেন এমন অপরাধ করেছে সেজন্য আরো শাস্তি দিত তাহলে হয়ত তার স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশ বাধাগ্রস্থ হত। কিন্তু সেই মা বাচ্চাকে আনন্দের সাথে শিক্ষা দেবার সাথে সাথে ক্লাসে শিক্ষকদের সামনে বা সহপাঠীদের সাথে ভদ্র ব্যবহারের শিক্ষা দিয়ে গেছেন তিলে তিলে। কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকেই শিশুটি স্কুলের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। স্কুলকে আনন্দের পরিবর্তে ভীতির স্থান হিসেবে দেখে। সেই মা তার মনস্তত্ত্ব দিয়ে স্কুল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। জেলার সবচেয়ে নামী সরকারি স্কুলে ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি করান। বাচ্চাটি যেন প্রাণ ফিরে পেল। কিন্তু কিছু দিন পর স্কুলের প্রথম সাময়িক পরিক্ষায় ক্লাস টিচার গণিতে ভালো নাম্বার তুলতে না পারার অপরাধে শিশুটিকে ক্লাসে তিরস্কার করেন সব বাচ্চাদের সামনে এবং বাচ্চাটিকে তুই বলে সম্বোধন করেন। ছোট্ট শিশু মনে তুই বলে সম্বোধন আর তিরস্কার ব্যাপক দাগ কাটে। আবার স্কুলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পরে শিশুটি। শিশুটির মানসিক অবস্থার উত্তরণে মা মরিয়া হয়ে উঠেন। সৃষ্টিকর্তার অশেষ কৃপায় এ যাত্রায় রক্ষা পায় শিশুটি। আমার সেই সহকর্মীর অন্যত্র বদলির আদেশ হয় এবং নতুন স্কুলে শিশুটি অনেক আন্তরিক পরিবেশে শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। পরবর্তীতে সে অনেক ভালো রেজাল্ট করে। দেশের প্রথম সারির খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পায়। শিশুটি জীবনে তার মানসিক অবস্থার উত্তরণ ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা পায় তার মায়ের মনস্তাত্ত্বিক বুদ্ধির জোরে।

উপরের এই চিত্রটি হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার নৈমিত্তিক চালচিত্র। এক সময় বলা হত Spare the rod, Spoil the child"। এখন আর সেদিন নেই। ইতালীয় লেখক মারিয়া মন্তিসেরি তার 'দ্যা সিক্রেট অব চাইল্ডহুড ' বইয়ে শিশুমনকে একটা সংবেদনশীল মন হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, "শিশুরা শুধুই শিশু নয়, তাদের রয়েছে সচেতন সত্তা"। তবে এই সচেতন সত্তাটি নরম মাটির মত। শিশুর পারিপার্শ্বিক জগত এবং তার সাথে সম্পৃক্ত মানুষ গুলো যদি কাঁচা মাটিকে মনের মত করে সুন্দর রূপ দিতে পারে তাদের ব্যবহারিক সৌকর্য দিয়ে তবেই শিশুটি পরিপূর্ণ হতে পারে ।

কিন্তু আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমত রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী নামক পরীক্ষার ভীতি। বাস্তবে এর উপযোগিতা না থাকলেও শিশু মনে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে বাড়তি একটা চাপ। যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক শিক্ষা এবং নিম্ন মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের কোন চাপই দেয়া হয় না। হেঁসে খেলে শিশুরা এই গন্ডি অতিক্রম করে আনন্দের সাথে। অথচ আমাদের কিন্ডার গার্টেন স্কুল গুলোতে শিশুদের ওজনের চেয়ে বেশি ওজনের স্কুল ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যেতে হয়। শিশু কালেই পড়াশুনার এত বোঝার চাপে শিশু শিক্ষার প্রতি হয়ে পড়ে বীতশ্রদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ রয়েছে শিশুদের উপর শিক্ষকদের তিরস্কার আর শাস্তির মত ভয়াবহ দিক। যদিও সরকার শারিরীক শাস্তি

বন্ধে আইন করেছেন তবুও এর ভয়াবহতা নির্মুল হয়নি। শিশুর মানসিক সক্ষমতা বিবেচনা করে যেমন পাঠ দান এবং শিক্ষা কারিকুলাম তৈরি করা দরকার তেমনি শিশুর সাথে শিক্ষকের আচার ব্যবহারেরও একটা নীতিমালা থাকা দরকার। এক্ষেত্রে মার্কিনীদের মত আমরা শিশু মনোবিজ্ঞানে পিএইচডি ধারীদের নিয়োগ দিতে না পারলেও অন্তত: শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হলেও এই শূণ্যতা টা পূরণ করতে পারি। কারণ শিক্ষক শিক্ষাদানের প্রধান হাতিয়ার। শিক্ষককে হতে হবে একজন উত্তম মনস্তত্ত্ববিদ। যারা এটি পারবেননা বা করবেন না তাদের এ পেশায় থাকা উচিত নয়। শিক্ষককে প্রয়োজনে ছাত্রের কাউন্সিলিং কাজ ও করতে হবে। কারন একজন শিক্ষার্থী বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা বাবা-মায়ের চেয়ে শিক্ষকের কথায় বেশি গুরুত্ব দেয়। কিন্তু সেই শিক্ষক যদি শিশু মনের ছোটখাটো ভুলত্রুটি না শুধরে তিরস্কার আর উপহাস করেন তাহলে শিশুর বিকাশ হবে বাধাগ্রস্ত। তাছাড়া শিশুর ছোটখাট সাফল্যেও শিক্ষক যদি তাকে প্রশংসা করেন তাতে অন্য শিক্ষার্থীরাও তা দেখে ভালো করার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত হবে। এসব দিক বিবেচনায় শিক্ষক কে ছাত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ মনস্তাত্ত্বিকের ভূমিকায় যেতে হবে। আমাদের স্বল্প আয়ের দেশে স্বল্প শিক্ষিত শিক্ষক দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠদানের ব্যবস্থা করলেও সেই শিক্ষকদের শিশু মনস্তত্ত্বের উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা যায়। এতে আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের স্কুল পালানো বা ঝরে পড়া রোধ করা সম্ভব হবে এবং শিশুরাও মানসিক প্রশান্তি নিয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারবে।

লেখক পরিচিতি

সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান
সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা

নারী নির্যাতন বাড়ছে কেন?

সালমা বেগম

নারী শুধু নারী নয়। নারী আত্মমর্যাদা সম্পন্ন একজন মানুষ। সন্তানের শিক্ষা হাতেখড়ি এই মায়ের কাছ থেকেই শুরু হয়। তাই তো সম্রাট নেপোলিয়ান বলেন, 'আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে শিক্ষিত জাতি দেব'। কিন্তু অর্ধেক জনসমষ্টি নারীকে অশিক্ষিত, পশ্চাৎপদ ও নির্যাতিত রেখে কোন জাতি কি শিক্ষিত হতে পারে? অথচ মানব সভ্যতার এই চরম যুগেও নারী বড় অসহায়, বড় দুর্বল। জন্মের পর থেকেই একজন মেয়ে তার পরিবারে নানা রকম বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয়, যা বিভিন্ন আঙ্গিকে সারাজীবন চলতে থাকে। বর্তমানে একটি সমাজে নারী নির্যাতন যেন একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু নারী তো আজ আর সেই ঘোমটাপড়া লাজুক বউটি হয়ে ঘরে আবদ্ধ থাকছে না। আজকের নারীরা প্রয়োজনের তাগিদেই পুরুষ শাসিত সমাজের শৃঙ্খল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায়। তাই নারী যখন ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে পা রাখছে, তখনই তাকে পদানত ও লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে। এভাবেই নারী জাতির মানবিক মর্যাদা দিনের পর দিন উপেক্ষিত হয়ে আসছে। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যাবে নারী প্রতি বঞ্চনা, নির্যাতন, লাঞ্ছনা ও শোষণের বিচিত্র ঘটনা। মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রার যুগেও নারী নির্যাতন এতটুকু কমেনি বরং রেড়েই চলেছে। এখন কথা হচ্ছে নারী নির্যাতন কি শুধু দৈহিক? আসলে যে কোন ধরনের শোষণই নারী নির্যাতন। তবে নারী নির্যাতন শুধু আমাদের দেশেই ঘটে তা কিন্তু নয়, বরং পৃথিবীর সব অঞ্চলেই এই নির্যাতনের ভয়াবহতা স্পষ্ট। এমন একটি দিন বাদ নেই যে, পত্রিকার পাতা খুললেই নির্যাতিত নারীর আর্তচিৎকার শোনা যায় না। পারিবারিক নির্যাতন, ধর্ষণ, ফতোয়া, নারী অপহরণ, নারী ও মেয়ে পাচার, বাধ্যতামূলক পতিতাবৃত্তি, বাধ্যতামূলক গর্ভধারণ, যৌতুক, কন্যা শিশু হত্যা ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক সংবাদ হয়ে দাড়িয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেও আমরা এ সকল অত্যাচারের প্রকট অবস্থা অবলোকন করছি। আন্তর্জাতিক স্তরের এক সমিক্ষায় দেখা গেছে, দক্ষিণ এশিয়ার ১৮-২০ শতাংশ মহিলা পারিবারিক হিংস্রতায় শিকার। নারী স্বাধীনতা নিয়ে যে দেশ সবচেয়ে বেশি সোচ্চার সেই যুক্তরাষ্ট্রের বয়ঃসন্ধির আগে তিন জন মেয়ের মধ্যে একজন যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ায় নারী পাচারকারী ব্যবসা অন্যান্য দেশ থেকে অনেক আগেই অনেক বেশি এগিয়ে গেছে। Human Right Watch নামের একটি মানবাধিকার সংস্থার মতে, কেউ পরিবারের পছন্দের বিয়েতে রাজী না হলে, যৌন নিপীড়নের শিকার কিংবা অত্যাচারী স্বামীর কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তালাক চাইলেই নারীরা অনার কিলিং-এর শিকার হয়। লাতিন আমেরিকা, এশিয়া

ও মধ্যপ্রাচ্যে এ নিয়ম প্রচলিত হওয়ায় তা মানবাধিকারের চরম লংঘন বলে বিবেচিত হয়েছে। যুদ্ধ বা অন্য কোন সংঘর্ষের সময়ও নারী নির্যাতনের হার আশংকাজনক ভাবে বেড়ে যায়। গোটা বিশ্বের পরিসংখ্যান নিলে দেখা যায়, উন্নত বা উন্নয়নশীল যে কোন রাষ্ট্রেই নিরবচ্ছিন্ন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে নারীরা।

তবে দুঃখজনক এই যে, আমাদের দেশে অধিক সংখ্যক নারীকে গৃহপরিচারিকার কাজ দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে দেশগুলোতেও পাঠানো হচ্ছে। সেখানে মানবতর জীবন-যাপনকারী এসব নারী গৃহকর্তার অশালীন আচরণের শিকার হয়ে নির্যাতিত হচ্ছে। আবার ব্যাপক দারিদ্র, ক্ষুধা, নির্যাতন, সমাজচ্যুতি প্রভৃতি কারণে অনেক মেয়ে পতিতাবৃত্তিতে নামতে বাধ্য হচ্ছে। এদের ৭৫ ভাগেরই বয়স ১৫-৩০ বছরের মধ্যে। এছাড়াও এদেশে বছর কয়েক লাখ অনিচ্ছাকৃত বা অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে, ১৯ শতাংশ গর্ভবতী নারী রক্ত ক্ষরণের কারণে মারা যায়, গর্ভপাতের কারণে মারা যায় ১৪ শতাংশ এবং সংক্রমণে মারা যায় ৮ শতাংশ। নারী গর্ভধারণ ও গর্ভপাতের পিছনে পুরুষের ইচ্ছার প্রধান্য পরিলক্ষিত হয়। এভাবে যৌতুকের দাবী, পরকীয়া, প্রেম প্রত্যাখ্যান, অভাব-অনটন ইত্যাদি নানা কারণে নারী নির্যাতন দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৯৯, ১৭ নভেম্বর গৃহীত এক সিদ্ধান্তে ২৫ নভেম্বরকে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন বিলোপ দিবস ঘোষণা করে। সমাজের এই ক্ষত থেকে গোটা সমাজ ও দেশকেও কলুষমুক্ত করতে হলে পুরুষের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী আরও উদার ও আধুনিক হতে হবে। পাশাপাশি নারী নির্যাতন রোধে নারীদের যেমন দৃঢ় মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে তেমনি নারী ঘটিত মামলা তদন্ত করার জন্য বিশেষ টিমে মহিলা পুলিশ সদস্য থাকা আবশ্যক। ধর্ষণ মামলায় প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল টেস্ট এবং সাথে ডিএনএ টেস্ট করার মাধ্যমে অপরাধীকে চিহ্নিত করার আধুনিক ব্যবস্থা চালু করার বিষয়টি বিবেচনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে,বাংলাদেশ আজো অধিকাংশ অভিভাবক অর্থনৈতিক পরাধিনতার অজুহাতে নারীকে জোরপূর্বক বিয়ে দিয়ে স্বামীর হাতেও তুলে দিতে কুণ্ঠিত নন। এতে নারীর পূর্ণ ব্যক্তিসত্তার বিকাশের আগেই অন্য পুরুষের অধীন হয়ে যায়।

প্রতিবন্ধী নারীরাও এখন নানা কায়দায় নির্যাতিত হচ্ছে। অথচ নির্যাতিত নারীও তার পরিবারের লোকজন সংকোচ, দ্বিধা বা ভয়ের কারণে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে সাহস পায় না। আবার যারা সুবিচারের আশায় মামলা মোকাদ্দমা করেন, তারাও অনেক সময় বিচার না পেয়ে সমাজপতিদের কাছ থেকে ধিক্কার সহ্য করেন। তবে প্রতিবন্ধী নারীদের প্রতি যৌন নির্যাতন বন্ধে সমাজ সচেতনতার পাশাপাশি কঠোর আইন প্রণয়ন করা জরুরী।

এ রকম কঠোর আইন গ্রহণ করলে নারীদের উপর অনেক পাশবিক আক্রমণ কমে যাবে। এইসব অপরাধীর মৃত্যুদন্ডই সবচেয়ে বড় শাস্তি। সুতরাং নারী কেবল নারী ভেবে নয়, মানুষের মর্যাদা দেয়ার মাধ্যমেই নারী মুক্তি সম্ভব। এক্ষেত্রে পারিবারিক ভাবে বাবা, ভাই ও স্বামীর সহযোগিতা যেমন অনস্বীকার্য, তেমনই নারীকে শিক্ষিত হয়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও লাভ করতে হবে। আমাদের দেশে এখন সময়ের দাবী বাঁচতে শেখার প্রতিষ্ঠাতা এঞ্জেলা গোমেজের মতো ব্যক্তিত্বদের, যাদের সহযোগিতায় এদেশে নির্যাতিত ও অসহায় নারীরা স্বপ্ন দেখবে একটি নতুন জীবনের।

লেখক পরিচিতি
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান
সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা।

তারণ্য ভাবনা

আখতার জাহান শাম্মী

কোন এক স্বর্ণালী ভোরে মনে হলো-জীবনের সকল আঁধার কাটিয়ে, দীপজ্বালা রাতে পৌছে গিয়েছি। এখানে পৌছানো তো-তারুণ্যের পাখায় ভর করেই। প্রস্তর যুগ থেকে ঐশ্বর্যময় আধুনিক যুগে পদার্পণ-এই তরুণদের সৃষ্টিশীল শক্তিতেই। অথচ আজ কি এক সন্ধিক্ষণে আমরা অবস্থান করছি জানিনা। আমাদের তরুণেরা কেউ কেউ বিদেশির বুকে বড় বড় পুরস্কার পেয়ে খ্যাতি অর্জন করছে, আমাদের প্রতিভাধর ক্রিকেট দল বাংলাদেশকে হৃদয়ে ধারণ করে অবিস্মরনীয় সাফল্য দেখিয়ে এগিয়ে চলছে আর পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বাংলাদেশকে পৌছে দিচ্ছে, বাঙালী জাতির স্বরুপকে চেনাচ্ছে। আর এক দল পরীক্ষার আগে উত্তরসহ প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার আশায় সারাবছর পড়াশুনা করছেনা। তারা তথ্য-প্রযুক্তির বিরূপ প্রভাবে অশ্লীল ছবি দেখা, ইভটিজিং, ইয়াবা আসক্তিতে মগ্ন। অন্য এক বড় দল বাংলা কথা, বাংলা উচ্চারণ, বাংলা বানান ভুলে গিয়ে হিন্দি, বাংরেজি কিংবা আধা ইংরেজী রপ্ত করে নিজেকে এক বিশেষ জাত প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত। এমনি এক মিশ্র তরুণ সমাজ আমাদের জন্য কি ভবিষ্যৎ উপহার দিবে? আমরা কি ভেবে দেখেছি? কিংবা ভাবলেও আমাদের দায় কর্তব্য নিয়ে আমরা কি ভাবছি? জীবন স্রোতে গা ভাসিয়ে আজ চলতে পারলেও আমাদের শেষ দিনগুলোতে যখন পরম মমতার স্পর্শ পাওয়ার জন্য চমকিত মনে, চকিত নয়নে অপেক্ষার প্রহর গুণব-সেই দিনগুলোতেও কি এমনি দিন কাটবে!

এই তরুণদের রক্ষা করতে হবে আমাদেরকেই স্বার্থে-এমন ভাবনা কী আমাদের কখনই অস্থির করবেনা? প্রত্যহের সেই চঞ্চলপ্রাণ তরুণদের ফিরে পাবার আশ্বাস আমাদের কে দেবে? তথ্য প্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার আমাদের মেঘের অন্ধকারে ঢেকে রেখেছে। এই অন্ধকার আমাদের প্রাণময় বাঙালীত্বকে গ্রাস করে ফেলেছে কিন্তু তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার যদি হয় ইতিবাচক ও নিয়ন্ত্রিত তবে সমগ্র মহাজাগতিক রহস্যের অবসান ঘটবে, বিজ্ঞানময় এ বিশ্ব তরুণদের পৌছে দেবে সাফল্যের স্বপ্ন চূড়ায়। এই তথ্য প্রযুক্তির হাত ধরে তরুণেরা পারিজাতের পাপড়ি ছড়ানো পথে পৌছে যাবে সত্যের দেশে, সুন্দরের দেশে। প্রযুক্তি আর অকৃত্রিমতার যুথবদ্ধতায় রচিত হবে স্বপ্নের স্বদেশ।

প্রত্যেক দিন স্বপ্ন দেখি-আমাদের তরুণেরা আলপথ ধরে হাঁটছে, গোয়াল আর মাটির সোঁদা গন্ধ অঙ্গে মেখে আপ্লুত হচ্ছে। আমাদের ভালোবাসার দৃঢ়তায় তারা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। আর বিস্মৃতি স্রোতের প্লাবনে যে তরী ভেসে আসছে-সেই তরী আমাদের তরুণদের স্বপ্নকে বয়ে নিয়ে আসছে। তাদের অন্তরের আলো শুধু ওদের উজ্জ্বল

করছেনা-আমাদেরও উজ্জ্বলিত করছে। সবার উজ্জ্বলিত আত্মবিশ্বাসই বাংলার ঘরে ঘরে লাখো প্রদীপ হয়ে জ্বলছে। তাইতো আমাদের অন্তর কবির সাথে বলে উঠে-

"আলো চাই, আর আলো
অন্তরের তিব্রতম আলো।"

-যে আলোর ঝর্ণাধারায় স্নাত হবে আমাদের তরুণেরা, গেয়ে উঠবে পাখি, সবুজ হয়ে উঠবে-হলুদ পাতাগুলো, জেগে উঠবে ঘুমন্ত মানুষগুলো। আর আমরা-অর্ধমৃত মানুষগুলো প্রাণের বণ্যায় প্লাবিত হব। সেই সোনালী দিনের স্বপ্ন কী পূরণ হবে! চারদিকে প্রাণের বাতাস আবার বইবে কি! আমরা স্বর্গপুরের নূপুরের তালে, ভাগ্য রাতের তারাদের নাচন দেখবার প্রতীক্ষায় থাকি। আজকের তারুণ্যের মনন ও জীবন সেই আলোকের অভিসারী হোক, দুর্গম সে আলোক যাত্রায় কান্ডারীর হাল ধরুক, সার্বিক গুরুভার তারাই নিক-নির্ভার চিত্তে আমরা প্রবীনেরা নিঃশ্বাস নেই- প্রত্যাশা এটুকুই। সকল আশা-নিরাশার দোলাচলে বসে শেষ অব্ধি ভরসা রাখি সমাজ ও সভ্যতা বিনির্মানের সেই মূল সারথী-তরুণ সমাজের উপর।

লেখক পরিচিতি
সহকারি অধ্যাপক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ
সরকারি আদমজীনগর এম. ডাব্লিউ কলেজ, নারায়ণগঞ্জ।

সমাজ পরিবর্তনে গান্ধীর সর্বোদয় তত্ত্ব

ফারজানা হোসেন

গ্রামভিত্তিক সমাজ কাঠামোর স্বনির্ভরতা অর্জনে মহাত্মা গান্ধীর অন্যতম আবিষ্কার এই সর্বোদয় তত্ত্ব। সর্বোদয় শব্দটির স্রষ্টা মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মা গান্ধী পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের পাশাপাশি সমাজে বিদ্যমান সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বর্ণ বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে সংগ্রাম করে যান। তিনি দেশের অনুন্নত বা অপেক্ষাকৃত কম সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীগুলোর সার্বিক উন্নয়নকে রাজনৈতিক কর্মসূচীর লক্ষ্যে পরিণত করেন। তিনি স্বনির্ভরতা অর্জনকে স্বাধীনতার পূর্বশর্ত বলে মনে করতেন এবং বিশ্বাস করতেন এই স্বনির্ভরতা অর্জিত হবে সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। গান্ধী সর্বোদয় তত্ত্বে যতটা রাজনৈতিক আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় তার থেকে অনেক বেশী সন্ধান পাওয়া যায় সামাজিক ও ধর্মীয় আদর্শের।

'সর্ব' এবং 'উদয়' এই শব্দ দুটির সমন্বয়ে সর্বোদয় শব্দটি গঠিত। সর্বোদয় শব্দটির আক্ষরিক অর্থ সকলের কল্যাণ। গান্ধী এই শব্দটি সর্বসাধারণের কল্যাণ অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি ভবিষ্যতের ভারতবর্ষে যে সমাজ প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেছেন তার রূপ হলো সর্বোদয় সমাজ। জন রাস্কিনের 'আনটু দিস লাস্ট' গ্রন্থের গুজরাটি ভাষার ভাবানুবাদ করে তিনি সর্বোদয় গ্রন্থটি রচনা করেন। গান্ধী তাঁর আত্মকথায় সর্বোদয়ের তিনটি নীতির কথা উল্লেখ করেন- (১) সমষ্টির কল্যাণের মধ্যেই ব্যক্তির কল্যাণ নিহিত; (২) জীবিকা অর্জনের অধিকার সকলের সমান। তাই উকিল ও নাপিতের কাজের মূল্য অভিন্ন; (৩) শ্রমভিত্তিক জীবনই হলো সার্থক জীবন, কারণ শ্রমের গুরুত্বই সর্বাধিক।

সর্বোদয় এমন এক ধরনের সমাজ ব্যবস্থা যেখানে বিশেষ কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর প্রাধান্য থাকবেনা। সর্বোদয় সমাজে সকল স্তরের মানুষ সমান মর্যাদার বলে পরিগণিত হবে। এই সমাজ ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী শোষিত বা অত্যাচারিত হবে না বরং শক্তিমান ব্যক্তিরা সমাজের দূর্বল ব্যক্তিদের রক্ষা করবে। সর্বোদয়ের প্রধান লক্ষ্য হলো সমাজে উচ্চমানের নৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। গান্ধী মনে করতেন সত্য, অহিংসা এবং সৎ উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে সর্বোদয় সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। মূলতঃ সকল ধর্মবিশ্বাসেরও মূল ভিত্তি সত্য ও অহিংসার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। গান্ধীর অহিংসা মানে বিশ্বজনীন প্রেম, এর অর্থ হলো অপরের কল্যাণ করা– সক্রিয়ভাবে সকলের কল্যাণ কামনা করা। শুধুমাত্র সত্যাশ্রয়ী, সাহসী ও আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তিরাই অহিংস নীতির অনুসারী হতে পারে। সর্বোদয় সমাজ হবে এমন যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যই নৈতিক মূল্যবোধকে বিশেষত সত্য ও

অহিংসাকে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করবেন এবং তা নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হবে। সত্য ও অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তি অপরের প্রয়োজনে আত্মত্যাগে অগ্রণী হবে। প্রত্যেকটি গ্রাম তার নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার চেষ্টা করবে। ব্যক্তি পর্যায়েও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকে আত্মনির্ভরশীল হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রথম কর্তব্য হবে সমাজের উপর বোঝা না হওয়া। ব্যক্তি যতটা আত্মনির্ভরশীল হবে ততটাই আবার পরস্পর নির্ভর হবে। তেমনিভাবে গ্রামগুলিও স্বয়ংসম্পর্ণতার পাশাপাশি পরস্পর নির্ভর হবে। এই নির্ভরতা সামাজিক শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করবে। আধুনিক শিল্পভিত্তিক সভ্যতার অহেতুক প্রতিযোগিতা, লোভ ও অসন্তুষ্টিকে দূর করতে তিনি ব্যক্তির আত্মিক শক্তিকে জাগ্রত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির ইতিবাচক ও নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য সুপ্ত অবস্থায় থাকে। ব্যক্তির সেই সুপ্ত বৈশিষ্ট্যের কোনটি বিকশিত হবে তা নির্ভর করে তার বেড়ে উঠার পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে। সর্বোদয় সমাজ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তিকে পূর্ণ বিকাশের অনুকূল পরিবেশ দিবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে আত্মসংযম এবং প্রকৃত প্রয়োজনীয় বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকার শিক্ষা দিতে হবে। আত্মশক্তিতে শক্তিমান জনসমষ্টি একে অপরের প্রয়োজনে নিজের স্বার্থ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করার জন্য দিক্ষীত হবে। কোন প্রত্যাশা ছাড়াই সমাজের প্রত্যেকে নিজের জীবনকে ত্যাগের মহিমায় পস্তুত করবে। অন্তত কিছু আত্মনিবেদিত ব্যক্তিকে অবশ্যই জনজীবনে এসব মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখার জন্য সংকল্পবদ্ধ হতে হবে।

সর্বোদয় সমাজের ধারণায় গ্রাম ও গ্রামীণ মানুষের পূণর্বাসনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। গান্ধী গ্রামকে জীবনের কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করতেন আর তাই তিনি স্বনির্ভর গ্রাম তৈরী করে স্বরাজ অর্জনের মাধ্যমে সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেন। সর্বোদয় সমাজ সংকীর্ণতা, আঞ্চলিকতাবোধ ও ধর্মান্ধতামুক্ত এবং ধর্মনিরপেক্ষ হবে। তিনি স্বরাজ অর্জনের পূর্বশর্ত হিসাবে নারীশোষণ ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পূনর্বাসনকে অন্তর্ভূক্ত করে স্বরাজ্যের আধ্যাত্মিক তাৎপর্যকে সম্প্রসারিত করেন। জনগণের শহরমুখী হবার প্রবনতা রোধ করতে শহর ও গ্রামের জীবনমাণের বৈষম্য কমিয়ে আনতে হবে। শহর ও গ্রামের মানুষের খাদ্য-পানীয়-বস্ত্র এবং জীবনযাপনের অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলীর মধ্যে গুণ ও মানের সমতা থাকতে হবে। গান্ধীর সর্বোদয় সমাজে সাধারণ মানুষরাই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের নির্বাচন করবে। আর এই গ্রাম প্রশাসন পরিচালনায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণকে তিনি যথার্থ মনে করেছেন। তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের কার্যকলাপে নৈতিক মূল্যবোধকে অনুসরণ করার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করেন। গান্ধীর স্বরাজের মাধ্যমে সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া ছিল ব্যাপক অর্থে মানবিক স্বাধীনতার সংগ্রাম। ব্যক্তির অন্তঃস্থ শক্তি, কর্মদক্ষতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশের সাহায্যে এবং স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে অনগ্রসর সমাজের প্রান্তিক

জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য তিনি যে পথ নির্দেশ দিয়ে গেছেন তা সর্বকালে অনুরূপ সমাজ ব্যবস্থায় অনুসরণীয় হয়ে থাকবে।

মহাত্মা গান্ধীর সর্বোদয় সংক্রান্ত ধারণা কল্পনাপ্রসূত হলেও আদর্শবাদের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ও সামাজিক পূর্ণগঠনের ক্ষেত্রে এটি একটি শক্তিশালী তত্ত্ব। তবে এটিও সত্যি যে, আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় এ তত্ত্ব প্রায় নির্ভুল। সভ্যতার বর্তমান পর্যায়ে এসে যেখানে প্রতিদিন পত্রিকার পাতা খুললেই আমরা দেখি মানুষের হিংস্রতার নানান নিদর্শন, অযাচিত প্রতিযোগিতায় অকালে যুবশক্তির বিনাশ, অতৃপ্ত ও অশান্ত সমাজ এবং সব পর্যায়ে সকল শ্রেণীর নারীর উপর নানা ধরনের নির্যাতন সেখানে মানুষকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষা দানের প্রয়োজন। নতুন প্রজন্মকে সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখাতে হবে মানুষ সভ্যতা অর্জনের সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে হিংসা পরিত্যাগ করে অহিংসার পথে অগ্রসর হয়েছে এবং মানবিকতার উন্মেষের মাধ্যমেই মানুষ ও পশুর পার্থক্য সূচীত হয়। এই ধরনের আদর্শভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সর্বোদয়ের আদর্শ অনুশীলন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

লেখক পরিচিতি

সহকারী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)

সবুজবাগ সরকারী মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।

ভারতবর্ষে নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও নারীবাদের উদ্ভব

ড. ফাহিমা আক্তার

সভ্যতার শুরু থেকে বিশেষ করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পর নারীরা বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার হয়। সমসাময়িক নানান পরিপ্রেক্ষিত থেকে তারা নিপীড়িত হতে থাকে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও লিঙ্গীয় প্রেক্ষাপটে এ নিপীড়ন যৌক্তিকতা পায়। এই যৌক্তিকতার মধ্য দিয়ে নারীর উপর যে সামাজিক বঞ্চনা বলবৎ হয় তাই নারীকে সমাজের সাথে তার সম্পর্কের স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করে। এই বোধ-বুদ্ধির মধ্য দিয়ে নারী তার স্বীয় অবস্থানকে পাঠ করতে সক্ষম হয়। পরিণতিতে তারা নিজের অধিকারের বিষয়ে সোচ্চার হয়। এরই মধ্য দিয়ে সূত্রপাত ঘটে নারী আন্দোলনের। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর ইউরোপে নবজাগরণ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহাসিক প্রভাব, মেরি ওলস্টোনক্রাফট, জন স্টুয়ার্ট মিল, হ্যারিয়েট টেইলর প্রমুখ উদারপন্থীদের সচেতন আগ্রহ ও চেষ্টায় নারীর সমস্যা ও অধিকারহীনতার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাঁরা ব্যক্তিগত অধিকার, সমঅধিকার, ভোটের অধিকার, বাক স্বাধীনতা, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক অধিকার, সমান কাজ করে সমান বেতন, জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা নারীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগের দাবি তোলেন। তাঁরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গীয় নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। নারীদের সামাজিক ভূমিকা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিঙ্গবৈষম্যর প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা থেকে নারী আন্দোলনের একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে ওঠে এবং পাশ্চাত্যে নারীবাদের সূচনা হয়।

নারী জাগরণের পাশ্চাত্য প্রবাহ ভারতবর্ষের চিন্তকদেরও প্রভাবিত করেছে। পাশ্চাত্যের নারীবাদ থেকে কিছুটা ভিন্নভাবে গড়ে ওঠেছে ভারতবর্ষের নারীবাদ। এ ভিন্নতার পিছনে রয়েছে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা। সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, প্রথার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত প্রভেদ রয়েছে। ভারতবর্ষে নারীবাদের যে উত্থান ঘটেছে তাতে পাশ্চাত্যের ছোঁয়া থাকলেও তা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ঐতিহ্য ও রুচির সাঙ্গে সমন্বিত রেখে বিকশিত হয়েছে। ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় নারীবাদ নারী নির্যাতন এবং নির্যাতন রোধ করে নারী মুক্তি আনয়ন ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে ভারতবর্ষে নারীবাদের প্রচলন শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। কিন্তু তার বহু পূর্ব থেকেই নারীর ওপর সামাজিক নির্যাতন বন্ধের জন্য অনেক মনীষী এগিয়ে আসেন। এই এগিয়ে আসার বহুমুখী উদ্যোগ আমরা লক্ষ্য করি। সামাজিক উদ্যোগের মধ্যে

রয়েছে নারীর প্রতি নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করা। এ আন্দোলন যেমন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত পেয়েছে, তেমনি এর আইনীয় প্রভাবও রয়েছে। তাঁরা নারীর ন্যায্য বিচার পাবার পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু নারী নিজেও যেন তার মুক্তি ও অগ্রগতিতে এগিয়ে আসেন সেজন্য সমাজ ও সামাজিক সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিত থেকে তাঁরা প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। প্রচেষ্টার এদিকটি হলো একেবারেই সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসর থেকে। নারীর জন্য সমতা বাস্তবায়নের প্রয়াসে তাঁরা একদিকে যেমন সমাজকে গুরুত্ব দিয়েছেন অন্যদিকে তেমনি গুরুত্ব দিয়েছেন সামাজিক বিধি ব্যবস্থায় লুকিয়ে থাকা অচলায়তন। এই অচলায়তন ভাঙ্গার কাজটি তাঁরা করেছেন যথেষ্ট সাহস ও প্রজ্ঞার সঙ্গে। ভারতবর্ষে যাঁরা নারীবাদী হিসেবে ভূমিকা রেখেছেন তাঁরা হলেন–রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), কালী প্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৯৭০),প্যারী চাঁদমিত্র (১৮৪১-১৮৮৩), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৭) প্রমুখ। মুসলিম প্রেক্ষাপটে ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী (১৯৩৪-১৯০৩) ও রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের (১৮৮০-১৯৩২) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উক্ত আলোচনাকে স্পষ্ট করার জন্য প্রথমেই আমরা দেখানোর চেষ্টা করব ভারতবর্ষের সামাজিক বাস্তবতায় নারীর অবস্থান কী? আলোচনার সূত্র ধরে এই বাস্তবতার সঙ্গে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব এখানে নারীবাদের উদ্ভাব কীভাবে ঘটেছে।

ভারতবর্ষের নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রাক বৈদিক যুগে নারীদের অবস্থান তুলনামূলক ভালো ছিল। সে সময় নারীরা পুরুষের ন্যায় অধিকার ভোগ করত এবং নারী নির্যাতনের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। নারী নির্যাতনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পিতৃতন্ত্রের উত্থানের ফলে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে নারীর উপর নির্যাতনের সূচনা হয় এবং এর বিরুদ্ধে নারীদের আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে নারী-পুরুষ কিংবা জাতি-বর্ণের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। আর্য-সামাজিক বিকাশের প্রারম্ভে বৈদিক সমাজে নারীদের সমানাধিকার ও মর্যাদার বিষয়ে বহু তথ্য প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের বসবাস ছিল। এ সময় নারীর প্রাধান্য ছিল। দ্রাবিড়দের মধ্যে নারীদেরই প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব প্রচলিত ছিল। সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। নারীরা স্বেচ্ছায় পুরুষ নির্বাচন করে সংসার করত। নারীর প্রাধান্যের কারণেই সে সময় বংশ ও অধিকার পুত্রগত ছিল না, কন্যাগত ছিল।

এর সূত্র ধরে নারীর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে ঋগ্বেদে।

ঋগ্বেদের যুগেও নারীর সমমর্যাদার কথা জানা যায়। নারীর প্রতি নিপীড়নের কথা বেদ-সাহিত্যে দেখা যায় না। সমাজে তখন নারীরা অবাধে ও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারতেন। বেদ শাস্ত্র রচনায়ও নারী ভূমিকা রয়েছে। ভারতীয় কৌম সামাজিক জীবনে মায়ের ভূমিকা আরো বেশি স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত ছিলো। কৌম সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থা ছিলো সাম্যবাদী। সবাই সমানভাবে উপার্জন করত এবং সবাই মিলে সমানভাবে ভোগ করত। এজন্য এ সমাজ ছিলো একাধারে মাতৃতান্ত্রিক, আবার সাম্যবাদী। তবে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে আর্য সামাজিক আধিপত্যবাদের বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে।

আর্যদের সময়েই মাতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথা ভেঙ্গে যায়। এর পরিবর্তে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। আর্যদের পূর্বে সতীদাহ প্রথারও প্রচলন ছিল না। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, খুব প্রাচীন কালে ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় আর্য জাতির মধ্যে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। অনার্যদের কাছ থেকেই এই প্রথা আর্য-সমাজে এসেছে। পঞ্চনদ প্রদেশের তক্ষশিলা অঞ্চলে গ্রিকদের প্রভাব ছিল বলে প্রমাণ আছে। খ্রিস্টের তিন-চারশ বছর আগে সে সব স্থানে সতীদাহ বেশি হতো।

আর্যদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ ও পশুপালন। এ সময় সম্পত্তির মালিকানা প্রশ্নে সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। বৈদিক আর্য সমাজে কৃতদাস প্রথারও আবির্ভাব ঘটে। এতোদিন ধরে উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর যে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল সে অধিকার পুরুষরা দখল করে এবং পরিবারে নারীকে পরিণত করে দাসে। শুধু বাঙালি নারী নয়, গোটা মানব জাতির মধ্যে নারীই সর্বপ্রথম দাসত্বের শৃঙ্খল পরেছে। এর প্রমাণ পৃথিবীর সকল সামাজিক ইতিহাসে রয়েছে। ইতিহাসে দাস প্রথারও আগে নারীর দাসত্ব যে শুরু হয়েছে তাও বিশ্বখ্যাত সমাজতান্ত্রিকরা প্রমাণ করেছেন।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীকে সন্তান জন্মদানের মাধ্যম হিসেবে ও পুরুষের ভোগের বস্তু হিসেবে বিবেচনা করা শুরু করে। তখন থেকে ভারতবর্ষের নারীরা তাদের অধিকার হারিয়ে নির্যাতিত হতে থাকে। এরপর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা ভারতবর্ষ শাসন করে। প্রতি যুগেই শাসকরা ধর্মকে ভিত্তি করে শাসন কার্য পরিচালনা করেছেন। ফলে সৃষ্টি হয়েছে নানা বৈষম্যের এবং এরই অংশ হিসেবে নারী পুরুষের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে বৈষম্য। সামাজিক জীবনে এ বৈষম্যের বিরুদ্ধে জোরালো ও সামতাবাদী অবস্থান লক্ষ্য করা যায় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতিতে। এ ধর্ম হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বাঙালির জীবনে নতুন চেতনা সৃষ্টি করে। জন্মান্তরবাদ থেকে মুক্তির দর্শন প্রচার করে অপুত্রক হওয়ার দুশ্চিন্তা থেকে বৌদ্ধ ধর্ম নারীকে মুক্তি দিল। পারলৌকিক কাজের বিষয় এই ধর্মে না থাকায় ছেলের প্রয়োজন থাকল না। ছেলে না থাকলে বাবার সম্পত্তি ও বংশ রক্ষায় মেয়ের অধিকার স্বীকৃত হলো বৌদ্ধ ধর্মে।

বৌদ্ধ ধর্মের শুরুতে বহু নারী প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় নির্যাতন থেকে বাঁচার আশায় বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং সংসার ধর্ম ত্যাগ করে ভিক্ষুনী সংঘে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু এ সময় মূলত সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থানগত কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। তবে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে (১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রিঃ) বাংলার নারীদের মধ্যে জাগরণ আসে। বৈষ্ণব সমাজ নারীর স্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদা দেয়। এসময় নারীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শাস্ত্র আলোচনা করতেন। অনেকক্ষেত্রে তারা শাস্ত্র সৃষ্টিতে অবদান রাখতেন। আধুনিক যুগে নারী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হওয়ার আগে বৈষ্ণবীরা মেয়েদের শিক্ষার একটা ধারা চালু করেছিলেন।

মধ্যযুগে মুসলমানরা যখন বাংলার শাসন শুরু করেন (১২০৪) তখন প্রচলিত বিধি বিধানের থেকে এই ধর্ম অনেকটা উদার ছিল এবং নারী নির্যাতন অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে ইসলাম নারীকে যেটুকু অধিকার দিয়েছে সেটুকু অধিকার বাংলার মুসলিম শাসকরা ভারতবর্ষের নারীদের দেন নি। ভারতের মুসলমান শাসকরা নারীদের পর্দার নামে ঘরে বন্দী করে রাখেন। এরপর আবার নতুন নতুন ঘোষণা দিয়ে নারীদের পায়ে শৃঙ্খল পড়াতে থাকেন। ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩০৯-১৩৮৮খ্রিঃ) ও সিকান্দার লোদী (১৪৮৯-১৫৭৭ খ্রিঃ) নারীদের ধর্মীয় পবিত্র স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ করলেন। বোরকা ও ঢাকা গাড়ি ছাড়া নারীদের চলাফেরা নিষিদ্ধ করা হলো। ফলে নারী ঘরে বন্দী হলো।

মুসলমান সমাজে নারীদের এমন অবস্থা অবলোকন করার পরও হিন্দু ধর্মের সতীদাহ প্রথা থেকে বাঁচার জন্য অনেক নারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মোঘল শাসনামলে সতীদাহ নিবারণের জন্য কিছু চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পারে নি। এ দিকে ধর্মান্তরিত নারীরা তাদের অভ্যাস বদলাতে পারে নি। ফলে মুসলিম সমাজেও সৃষ্টি হলো অভিজাত শ্রেণি। শিক্ষাসহ সকল সুযোগ সুবিধা অভিজাত নারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পাঠান ও মোঘল শাসন আমলে তাই ভারতবর্ষের নারী সমাজের মূল্য কোনভাবেই বৃদ্ধি পায় নি।

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তে মুসলমানদের পরাজয়ের মাধ্যমে এদেশে কোম্পানির শাসন শুরু হয়। এর মাধ্যমে এ দেশে মধ্যযুগীয় চৈতন্যে ইউরোপীয় প্রভাব সূচিত হয়েছিল। পলাশীর নির্মম প্রহসনের পরবর্তী ইতিহাস ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ধারাকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করেছিল। এ সময় একদিকে পাশ্চাত্যের অনুকরণের দিকে আগ্রহ অন্যদিকে প্রাচীন আচারের প্রতি আকর্ষণ, নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ধরে রাখার আগ্রহ, এর মধ্যে একটি দ্বন্দের সৃষ্টি হয়। রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীর সচেতন আগ্রহে পাশ্চাত্যের ভাবধারার সাথে আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টায় এ দেশের সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতার বিরুদ্ধে নবজাগরণের সূচনা হয়।

নবজাগরণের মানবকল্যাণমুখী জাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নারী জাগরণ। নারীদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এতই অসহায়, দুর্বল ও অধিকারহীন করে রাখা হয়েছিল যে, তারা নিপীড়িত হয়েও নিজেদের মুক্তির কথা ভাবতে পারে নি। নবজাগরণের ফলে সমসাময়িক হিন্দু নারী সমাজকে তাদের অবহেলিত ও অধঃপতিত অবস্থা হতে উত্তরণে চেষ্টা করা হয়। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ হিন্দু নারীর অবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমেই সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের আন্দোলনের মুখে হিন্দু ধর্মীয় আইনের কিছু পরিবর্তন যেমন– সতীদাহ প্রথার বিলোপ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ বন্ধ ইত্যাদি পাস হয় এবং তাঁরা নারী শিক্ষার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ব্রিটিশ শাসনামলেই খ্রিস্টান মিশনারিদের ও দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহায়তায় নারী শিক্ষার প্রসার ঘটে। কিন্তু এ শিক্ষা শুধু অভিজাত হিন্দু ও মুসলিম শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষের আপমর নারী এমনকি পুরুষরাও বিভিন্ন অধিকার ও সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল।

ব্রিটিশ সরকার নারীদের নিপীড়ন বন্ধের জন্য কিছু আইন করলেও সামগ্রিকভাবে নারীর উন্নয়নের জন্য তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। ফলে ভারতবর্ষের নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটে নি। তাছাড়া নবজাগরণের ফলে হিন্দু নারীর অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হলেও এ দেশের মুসলমান নারী সমাজের ওপর এর তেমন কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নি। বস্তুত এ সময় ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সমাজ ক্ষমতা হারিয়ে হতাশা ও নৈরাজ্যে ভুগছিল। তারা বিদেশী শাসন ও সংস্কৃতি মেনে নিতে পারে নি। ফলে মুসলমানরা অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে এবং ধর্মীয় শুদ্ধিকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করে। এর ফলে মুসলমান সমাজ সমসাময়িক অবস্থা থেকে পিছিয়ে পড়ে।

মুসলমান সমাজের এমন সংকটময় সময় স্যার সৈয়দ আহমদ ও বাংলার নওয়াব আব্দুল লতিফ এগিয়ে আসেন। তাঁরা মুসলমানদের সাথে ব্রিটিশ শাসকদের সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করেন। তাঁরা ব্রিটিশ শাসন মেনে নিয়ে পাশ্চত্য শিক্ষা গ্রহণে মুসলমান সমাজকে উদ্যোগী করে তোলেন। কিন্তু মুসলিম নারীর শিক্ষার বিষয়ে তাঁরা আগ্রহী হলেও এ ক্ষেত্রে রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দেন। এজন্য মুসলিম নারী সমাজের অবস্থার তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। তাছাড়া এ সময় মুসলিম ধর্মীয় আইনেরও কোনো পরিবর্তন হয় নি। মুসলমান নারীদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে মুসলিম ধর্মীয় আইন দ্বারা। ফলে একই সময় একই দেশের নারীদের মাধ্যে দুই ধরনের অধিকার নির্দেশিত ছিল। এ সময় বিভিন্ন মনীষীদের সহায়তায় নারীর সামাজিক নিপীড়ন বন্ধের আন্দোলন শুরু হলেও নারীবাদের উদ্ভব ঘটে আরও পরে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের দিকে মূলত নারীবাদের সূচনা হয়।

পাশ্চাত্যের মতো ভারতবর্ষের নারীবাদের আন্দোলনের ইতিহাসকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায় ১৮৫০ সাল থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত গণ্য করা হয়। এসময় ঔপনিবেশিক আধুনিকতার ফলে গণতন্ত্র, জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার, জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার প্রশ্নে শিক্ষিত সমাজে জাগরণ আসে। এসময় রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অক্ষয় কুমার দত্ত, কেশব চন্দ্র সেন প্রমুখ সমাজে নারীর অবস্থান উন্নয়নের জন্য সমাজে প্রচলিত নারী নিপীড়নমূলক প্রথাগুলো নির্মূলের জন্য আন্দোলন করেন। এ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে সতীদাহ প্রথা, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ রোধ প্রভৃতি রোধের জন্য আইন পাস হয়। নারী নির্যাতন রোধের জন্য নারী শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে এ সময় অনেক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।

১৮৪০ সাল থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে বেশ কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাগুলো নারী শিক্ষা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করে নারী শিক্ষাবিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পত্রিকাগুলো হলো–'বিদ্যাদর্শন' (১৮৪২), 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩-৫৫), 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' (১৮৪২), 'সর্বশুভকারী পত্রিকা' (১৮৫০), 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫৫), 'বামবোধিনী পত্রিকা' (১৮৬৩), 'অবলাবান্ধব' (১৮৬৯) প্রভৃতি।

১৮৮৬ সালের দিকে স্বর্ণকুমারী দেবী 'সখী সমিতি' প্রতিষ্ঠা করে নারীদের উন্নয়ন মূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। প্রথম দিকে এটি হিন্দু সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তা মুসলিম নারীদের মধ্যেও শুরু হয়। কুমিল্লার নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী, মুর্শিদাবাদে নওয়াব ফেরদৌস মহল, কলকাতায় খুজিস্তা আক্তার সোহরাওয়ার্দী এবং সর্বোপরি রোকেয়া এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরাধীনতা ও শৃঙ্খলিত অবস্থা থেকে নারীকে মুক্ত করার জন্য এরা নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় মুসলমান পরিচালিত ও সম্পাদিত কিছু পত্রিকা, যেমন– 'সুধাকর' (১৮৮৯), 'কোহিনূর' (১৮৯৮), 'নবনূর' (১৯০৩), 'মোহম্মদী' (১৯০৩), 'আল-এসলাম' (১৯১৫) প্রভৃতি নারী শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ১৯১৩ সালে সরলা দেবীর আহ্বানে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে 'ভারত স্ত্রী মহামন্ডল' নামে একটি প্রতিষ্ঠান ও সংঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

মুসলিম নারী জাগরণের সূচনা পর্বে বেশ কিছু মুসলিম সমিতি নারী জাগরণের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। ১৮৬৩ সালে নওয়াব আব্দুল লতিফ মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে পশ্চাৎপদ নারী সমাজের জাগরণের জন্য কাজ করেন। ১৮৭৮ সালে সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে নারী শিক্ষা

ও আইন বিষয়ে কাজ করে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করা ও নারী প্রগতির ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথকে সুগম করেছিল। এছাড়া ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী (১৮৮৩) ও বংগীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি (১৯০৩) নারী শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার জন্য ব্রতী হয়ে ১৯০৯ সালে একটি বালকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই ছিল মুসলিম মেয়েদের জন্য প্রথম স্থায়ী বিদ্যালয়। তাঁর এ সহসিক পদক্ষেপ পরবর্তী সময়ে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে তথা নারী জাগরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

১৯১৬ সাল থেকে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তের সময় পর্যন্তকে নারী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় বলে ধরা হয়ে থাকে। এ পর্যায়ে 'সওগাত' (১৯১৮) পত্রিকা প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করে। বাঙালি মুসলমান সমাজের বিকাশ ও প্রগতিতে 'সওগাত' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯১৬ সালে 'আঞ্জুমানে খওয়াতিনে ইসলাম' নামে একটি নারী সমিতি প্রতিষ্ঠা করেনরোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। এটি মুসলিম নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অবরোধ থেকে মুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরই মধ্যে ভারতবর্ষে স্বদেশী আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হতে শুরু করে। এ সময় নারীরা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মাতৃমঙ্গলের উন্নতির ব্যবস্থা করা ও পুরুষের সমান নারীর ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। মহাত্মা গান্ধী সব সময় নারীর সমানাধিকারের বিষয় তাঁর মত প্রচার করে নারীদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিতে বলতেন। ১৯২১ সালে মাদ্রাজের আইন সভায় প্রথম মাদ্রাজের নারীদের ভোটাধিকার দেয়া হয়। ১৯৩৫ সালে ভারতের নারীসমাজ ভোটাধিকার লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি লাভ করে।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পর নারীবাদী আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়। স্বাধীনতার সময় জওহরলাল নেহেরু আর তাঁর সহকর্মীদের নেতৃত্বে ভারতের যে গণতান্ত্রিক সংবিধান রচিত হয় তাতে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান রাজনৈতিক সামাজিক অধিকারের বিষয়টি মেনে নেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, তখন পর্যন্তও আমেরিকায় Equal Right Amendment পাস করা হয় নি। এসময় থেকে নারীবাদী চিন্তার প্রসার ঘটতে শুরু করে। নারীরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করতে থাকে।

এ সময় নারীবাদ ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক উভয় দিক থেকে সংগঠিত হতে থাকে। আশাপূর্ণা দেবীর বিখ্যাত ট্রিলজি– প্রথম প্রতিশ্রুতি (১৯৬৫), সুবর্ণলতা (১৯৬৭), ও বকুল কথা (১৯৭৪)- এর মাধ্যমে নারীকে মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কতটা কঠোর হতে পারে তা ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে সমাজে নারীর অবস্থান তুলে ধরেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বুড়ি (১৯৬৩), তারকাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ডাইনি (১৯৭৩) এর মাধ্যমেও নারীবাদী চিন্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। শেষতক পর্যায়টির রেশ ধরেছেন মহাশ্বেতা দেবী। তিনি তাঁর হাজার চুরাশীর মা, দ্রোপদী, স্তন্যদায়িনী প্রভৃতি লেখার মাধ্যমে সমাজে নারীর অবস্থান যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে তা তুলে ধরেছেন এবং এর থেকে নারীকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। তাঁদের এ লেখার সূত্র ধরেই পরবর্তী কালে আরো অনেকে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা নিয়ে লিখেছেন ও লিখছেন। এরই মাধ্যমে নারীবাদ হয়ে উঠেছে পরিচিত ও জনপ্রিয়।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাঙালি জাতির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম উপাদানে পরিণত হয়েছিল নারী মুক্তি আন্দোলন। ষাট থেকে আশির দশক পর্যন্ত মহীয়সী নারী সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে এদেশের নারী আন্দোলন বেগবান হয় এবং তা সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সহযোগী হয়ে উঠে। এ দেশের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তির সংগ্রাম পর্যন্ত অনেক নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। পরবর্তী কালে বিভিন্ন নারীদের লেখায় গ্রামীন দরিদ্র নারীর ও মধ্যবিত্ত নারীর জীবনধারা সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং নারী মুক্তির আবশ্যকতা তুলে ধরেন। বর্তমান সময়ে সরকার ও দাতাগোষ্ঠির আর্থিক সহযোগিতায় অনেক নারী সংগঠন তৃণমূলে নারী জাগরণ সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করছেন এবং নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টা চলছে।

লেখক পরিচিতি
সহকারী অধ্যাপক (দর্শন)

ফেমিনিজম: উৎস, শাব্দিক এবং সাহিত্যিক প্রেক্ষণ বিন্দু

খালেদা জাহান

"কেউ নারী হয়ে জন্মায় না,
সমাজই তাকে নারী করে তোলে।"

-[দি সেকেন্ড সেক্স-১৯৪৯]

নারী সম্পর্কে এই ধ্রুপদী মন্তব্যটি করেছেন বিখ্যাত নারীবাদী দার্শনিক সিমঁ দ্য বুভোয়ার। সমাজে নারীদের প্রকৃত অবস্থান চিহ্নিত করতে গিয়ে বুভোয়ার রচনা করেন অসামান্য গ্রন্থ 'দ্য সেকেন্ড সেক্স (The Second Sex- 1949) এই গ্রন্থে তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে যে দ্বিতীয় লিঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেই সত্যকেই বাণীবদ্ধ করেছেন।

নারীবাদের উৎস:

বিশ্বব্যাপী নারীরা যে অন্ত্যজ জীবন যাপন করছেন তার প্রতিবাদে এবং নারীদেরকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করার দাবীতে সমাজবিজ্ঞান এবং পরবর্তীতে সাহিত্যিক ফরম (From) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে নতুন এক ইজম যা ফেমিনিজম (Feminism) তথা 'নারীবাদ' হিসেবে পরিচিত। ১৮৩৭ সালে 'ফেমিনিজম' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসী দার্শনিক চার্লস ফুয়েরার (Charles Fourier), এরপর ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডে 'ফেমিনিজম' ও ফেমিনিষ্ট (Feminist) শব্দটি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকায় শব্দদ্বয় পরিচিতি পায় যথাক্রমে ১৮৯০ এবং ১৯১০ সালের দিকে। শব্দ দুটি Oxford English dictionery- তে অন্তর্ভূক্ত হয় ১৮৯৪ (Feminist) ১৮৯৫ (Feminism) সালে। ভারতবর্ষে শব্দটি নারীবাদ হিসেবে পরিচিতি প্রায় বিশ শতকের গোড়ার দিকে। নারীর অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী ফেমিনিষ্টমুভমেন্ট (Women rights should be considered Feminist Movement) যাত্রা শুরু করে উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুর দিকে। পাশ্চাত্যের সমাজতাত্ত্বিকগণ ফেমিনিজমের ধারাকে তিনটি ধাপে বিভক্ত করেন। (divided into three waves) মূলত তিনটি আলাদা আলাদা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই ধাপ তিনটি প্রতিষ্ঠা পায়, যথা-

(ক) প্রথম ধাপ (First waves): (১৮৯০-১৯৬০খ্রি.) নারীর ভোটাধিকার ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা,

(খ) দ্বিতীয় ধাপ (Second waves): (১৯৬০-১৯৯০খ্রি.) নারীর স্বাধীনতা এবং লিঙ্গ বৈষম্য নিরসনে কর্মপন্থা গ্রহণ।

(গ) তৃতীয় ধাপ (Third waves): (১৯৯০ থেকে বর্তমান): দ্বিতীয় ধাপের অসম্পূর্ণ কাজগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

নারীর শাব্দিক পরিচিতি:

প্রাচ্য কী প্রতীচ্য সর্বত্রই নারীর অবনত অবস্থানের কারণ মূলত প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের হীন দৃষ্টিভঙ্গি। সমাজে নারীর অবস্থান অনুধাবন করতে প্রচলিত স্ত্রীবাচক শব্দগুলোর বুৎপত্তিই যথেষ্ট। যথা

স্বয়ং নারী শব্দের প্রকৃত অর্থ- 'যে পুষ্টি দান করে'- অপরদিকে 'স্ত্রী' শব্দের বুৎপত্তিতে দেখা যায়- 'শুক্র শোনিত যেখানে কাঠিন্য পায়'- অর্থাৎ এই শব্দটি গর্ভধারনকেই ইঙ্গিত করেছে। এছাড়া 'ভৃত্য' এবং '-ভার্যা' একই ক্রিয়ামূলক নিষ্পন্ন 'ভৃ' ধাতু থেকে আগত যার অর্থ ভরণপোষণের বিনিময়ে সেবা দান করা। সংস্কৃতে ভার্যা সম্পর্কে যে উক্তি করা হয়েছে সেটাও নিতান্ত অবমাননাকর,

যেমন- "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' অর্থাৎ ভার্যা পুত্র উৎপাদনের যন্ত্র।"

'কন্যা' মানে 'কাম্যা' যা কামনা শব্দকে প্রতিনিধিত্ব করেছে।

আর কন্যা থেকে 'কামিনী' শব্দটি এসেছে যা সরাসরি কামনা বাসনাকে ইঙ্গিত করেছে। 'কন্যা' শব্দ দিয়ে কামিনী বুঝালেও 'পুত্র' শব্দটি দিয়ে বুঝায় পুৎ নামক নরক থেকে উদ্ধারকারী হিসেবে। কন্যা এবং পুত্র একই শব্দ কিন্তু লিঙ্গগত পার্থক্যের জন্য অর্থের এই বিশাল ফারাকই প্রমাণ করে সমাজে নারী পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলা শব্দ অঙ্গনা, রমনী, বধু, ললনা, প্রমদা, যোষা, যোয়িৎ, বনিতা এরূপ অসংখ্য শব্দের মাধ্যমে নারীদের ডাকা হয় যেগুলোর অর্থ হয় পুরুষের সেবাদাসী, বিনোদ দায়িনী নতুবা সন্তান উৎপাদনের মাধ্যম। কেবল বাংলা ভাষায় স্ত্রীবাচক শব্দের এরূপ হীনদশা নয়, বিশ্বের প্রায় সকল ভাষার চিত্রই নিদেনপক্ষে একই রকম। যেমন- ইংরেজীতে mistress, madam প্রভৃতি শব্দের বুৎপত্তিগত ইতিহাস নারী-পুরুষের সাম্যকে প্রতিনিধিত্ব করে না। Woman শব্দটি এসেছে Wisheman থেকে অর্থাৎ এই শব্দ দিয়ে নারীর কোনো স্বতন্ত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। সে অন্যের পরিচয়ে পরিচিত হবে। অন্যদিকে mistress শব্দের আসল অর্থ 'অবৈধ প্রেমিকা' যা বর্তমানে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে। আবার madam শব্দের বুৎপত্তিই (ma dam - my Lady) (অর্থাৎ স্ত্রীলোকের প্রতি প্রণয় সম্বোধন) প্রমাণ করে এই শব্দের আসল চেহারা। সময়ের বিবর্তনে madam শব্দটি সম্মান সূচক সম্বোধনে ব্যবহারের প্রচলন হয়।

বাংলা সাহিত্যে নারীবাদের স্বরূপ:

ভারতীয় উপমহাদেশে একুশ শতকের এই উত্তরাধুনিক (postmodern) যুগেও নারীরা ভীষণভাবে নিগৃহীত হচ্ছে। যদিও উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এই প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের খানিকটা প্রয়াশ লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের(১৮২০-১৮৯১) বিধবা বিবহের আইন পাশের(১৮৫৬) আন্দোলন ও সফলতা, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ রহিত করার সামাজিক আন্দোলন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আন্যদিকে উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে নারী মুক্তির আন্দোলনের সূচনা ঘটে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) হাত ধরে। এরই যোগসূত্র মাইকেল মধুসূদন দত্ত(১৮২৪-৭৩) সাহিত্যে সৃষ্টি করলেন বীর নারীদের দৃষ্টান্ত: তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র(১৮৬১) প্রমীলা চরিত্রের মাধ্যমে দেবতা রামকে কটূক্তি করে মূলত পুরুষতন্ত্রকে একহাত নিলেন।

"আমি কী ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে?"

[মেঘনাদবধ কাব্য-১৮৬১]

এছাড়া 'বীরঙ্গনা কাব্যে'ও কবি এগারো জন পৌরাণিক নারীকে উপস্থাপন করলেন একেবারে আধুনিক সাজে সজ্জিত করে। নারীকে অবনত করে রাখতে সমাজপতিদের যে হাজার বছরের চেষ্টা তার মূলে কুঠারাঘাত করা অন্যতম সাহিত্যিক হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোট গল্প এবং উপন্যাসে এমন সব নারীদের সমাবেশ ঘটিয়েছেন যারা মানুসিকতার দিক থেকে একুশ শতকের নারীদেরও ছাপিয়ে যায়। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণাল, 'পয়লা নম্বর' গল্পের অনীলা, 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী, 'ল্যাবরেটরি' গল্পের সোহিনী, 'চোখের বালি' উপন্যাসের বিনোদিনী, 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুদিনী, 'শেষের কবিতা'র লাবন্য, প্রভৃতি চরিত্র রবীন্দ্রনাথের নারীবাদী মানসকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। বাংলা সাহিত্যে নারী-ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার কাজ আরো খানিকটা এগিয়ে নিয়ে গেছেন কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়(১৮৭৬-১৯৩৮),তাঁর 'গৃহদাহ' উপন্যাসের অচলা, 'পল্লীসমাজে'র রমা, 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ী, 'শ্রীকান্তে'র অভয়া, 'শেষপ্রশ্নে'র কমল, প্রভৃতি চরিত্র নারীবাদী চিন্তার ক্ষেত্রে প্রাতিস্বিকতা চিহ্নিত। এছাড়া বাংলা সাহিত্যে রিয়ালিজমেরধারক ও বাহক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ সাহিত্যিকের লেখায় নারীদের উজ্জল উপস্থিতি দেখা যায়।

উপর্যুক্ত সাহিত্যিকগণ তাঁদের লেখনীতে নারীকে ব্যক্তিত্বপূর্ণ করে উপস্থাপনের প্রয়াশ পেয়েছেন ঠিকই কিন্তু নারী-মুক্তির প্রতিবন্ধকতা গুলোকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারেননি, কারণ তাদের সৃষ্ট কোনো চরিত্রই সমাজকে অতিক্রম করে মুক্তি লাভ করেনি। উপমহাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীবাদের প্রথম প্রবক্তা হলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত (১৮৮০-১৯৩২) তিনি তাঁর 'মতিচুর' (১৯০৪) প্রবন্ধ

গ্রন্থে নারী পুরুষের সমকক্ষকতার পক্ষে যথাযত যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাবলম্বন অর্জনের গুরুত্ব তুরে ধরেছেন। শিক্ষার অভাবই যে নারীদের পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ এই সত্য বেগম রোকেয়া দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর 'সুলতানার স্বপ্ন' (১৯০৫) গ্রন্থটি নারীবাদী ইউটোপিয়ান সাহিত্যের ক্লাসিক নিদর্শন বলে বিবেচিত, এছাড়া পর্দাপ্রথার নামে যে নারীদেরকে কৌশলে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখা হয়েছে সেই সত্যকে উপস্থাপন করেছেন 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থে। বেগম রোকেয়াই প্রথম প্রমাণসহ দেখিয়েছেন দেশের অর্ধেক জনশক্তিকে তথা নারীদেরকে শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

বাংলা সাহিত্যে নারীকে মর্যাদাপূর্ণ করে তুলে ধরা আরেকজন মহান পুরুষ হলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন-

"সাম্যের গান গাই-
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই"
[নারী, সাম্যবাদী]

নারী পুরুষের সাম্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে নজরুল আরো বলেন

"নর যদি রাখে নরীরে বন্দি, তবে এরপর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভূগে,"
[নারী, সাম্যবাদী]

নারীবাদের মূল সুর তথা নারীকে নারী নয় মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করতে হবে এই সত্যকে নজরুল মনেপ্রাণে ধারন করতেন তাই তিনি সাহসী কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন-

"অসতি মাতার পুত্র সে যদি জারজ পুত্র হয়
অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়।"
- [বীরাঙ্গনা, সাম্যবাদী]

সাহিত্যে মূল্যায়নের ক্ষেত্রের ফেমিনিজম অপেক্ষাকৃত নতুন ধারা হলেও সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর সূচনা হয় অনেক আগে। কারণ অষ্টাদশ মতকের শেষের দিকে মেরি উইলস্টোনক্রাফট 'এ ভিন্ডিকেশন অফ দি রাইটস ওম্যান' বইটি রচনা করেন ১৭৯২ সালে। এই বইটি সমাজে নারীর অবমূল্যায়ন প্রত্যক্ষ করেই লেখা হয়েছে। এছাড়া মার্কিন লেখিকা মার্গারেট ফুলারের উওম্যান ইন দি নাইনটিনথ সেঞ্চুরি (১৮৪৫), জন ষ্টুয়ার্ট মিলের' দি সাবজেকশন অব উইমেন(১৮৬৯), ভার্জিনিয়া উলফের 'এ রুম অব ওয়ানস ওন' প্রভৃতি গ্রন্থে ফেমিনিজমের কাসিক দলিলের মর্যাদা অর্জন করেছে। এছাড়া বিশ এবং একুশ শতকে নারীবাদের পক্ষে পৃথিবীর সর্বত্রই বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সমাজবিজ্ঞানী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, এবং নারীবাদকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। সাহিত্যকোষ : কবীর চৌধুরী
২। নারী : ড. হুমায়ুন আজাদ
৩। মধুসূদন রচনাবলী : [বিশ্বভারতী, কলকাতা-২০০১]
৪। রোকেয়া রচনাবলী (অখন্ড) : [বাংলা একাডেমী, ২০০৬]
৫। সঞ্চিতা : কাজী নজরুল ইসলাম, [নজরুল ইন্সটিটিউট-২০০৫]
৬। গল্পগুচ্ছ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, [বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৯৯৭]
৭। শরৎ সন্দর্শন : জীবেন্দ্র সিংহ রায় | কলকাতা-১৯৭৬]

লেখক পরিচিতি
প্রভাষক (বাংলা বিভাগ)
সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সিগঞ্জ।

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের কিছু কার্যক্রম

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের ৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বক্তব্য রাখছেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের ৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী
শেখ হাসিনার সাথে নেটওয়ার্কের সদস্যবৃন্দ

৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে নেটওয়ার্কের সদস্যদের
নৃত্য পরিবেশনা

৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা
উপভোগ করছেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর উদ্বোধনী ও জেন্ডার গাইড লাইন হস্তান্তর

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর উদ্বোধনী ও জেন্ডার গাইড লাইন হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি ও সদস্যবৃন্দ

চাঁদপুর জেলা বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর সদস্যদের সাথে সভাপতি

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর মতবিনিময় সভা

স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্সের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্সে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে নেটওয়ার্কের
সদস্যবৃন্দের সংগে সভাপতি ও মহাসচিব

স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে সভাপতি ও নেটওয়ার্কের সদস্যবৃন্দ

লালমাটিয়া মহিলা কলেজে অনুষ্ঠিত বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি অবহিতকরণ কর্মশালা

লালমাটিয়া মহিলা কলেজে বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি অবহিতকরণ কর্মশালায় অধ্যক্ষকে সম্মাননা প্রদান করছেন সভাপতি

লালমাটিয়া মহিলা কলেজে বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি অবহিতকরণ কর্মশালায় মহাসচিবকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে এক শিক্ষার্থী

লালমাটিয়া মহিলা কলেজে বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি অবহিতকরণ কর্মশালায় উপস্থিত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ তে প্রধান অতিথির সাথে কিছু মুহূর্ত

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ তে অতিথিবৃন্দের সাথে
নেটওয়ার্কের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ তে 'স্বজন' সাহিত্য সাময়িকী
৪র্থ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ তে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের একাংশ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ তে সভাপতি ও উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ তে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ তে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ তে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর সভাপতি কে ফুল দিয়ে বরণ করছেন
মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রশাসন

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৭ উদযাপন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৬ তে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৫ তে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

ঈদ পুনর্মিলনী-২০১৭ তে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন
জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম, মন্ত্রীপরিষদ সচিব

ঈদ পুনর্মিলনী-২০১৭ তে উপস্থিত সদস্যদের একাংশ

ঈদ পুনর্মিলনী-২০১৭ তে নেটওয়ার্কের সদস্যের সংগীত পরিবেশনা

ঈদ পুনর্মিলনী-২০১৭ তে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সদস্যবৃন্দ

বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি অবহিতকরণ কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি অবহিতকরণ কর্মশালায় উপস্থিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

আয়কর বিষয়ক অগ্রিম প্রস্তুতি ও রিটার্ন তৈরির
পদ্ধতি বিষয়ক সেমিনার

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে সার্ভিক্যাল এন্ড ব্রেস্ট ক্যান্সার
স্ক্রীনিং ক্যাম্প আয়োজন

সার্ভিক্যাল এন্ড ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রতিরোধমূলক সচেতনতা প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন জনাব সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সার্ভিক্যাল এন্ড ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রতিরোধমূলক সচেতনতা প্রোগ্রামে নেটওয়ার্কের সভাপতি ও মহাসচিবের সাথে সদস্যবৃন্দ

১ম বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১৪

২য় বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১৭

সিলেট বিভাগে নেটওয়ার্কের উদ্যোগে
বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও জেলা প্রশাসন মুন্সীগঞ্জের যৌথ উদ্যোগে
শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও জেলা প্রশাসন নাটোরের যৌথ উদ্যোগে
প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও জেলা প্রশাসন নাটোরের যৌথ উদ্যোগে
শিশু ও নারীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও জেলা প্রশাসন মৌলভীবাজারের যৌথ উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও জেলা প্রশাসন মৌলভীবাজারের যৌথ উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ